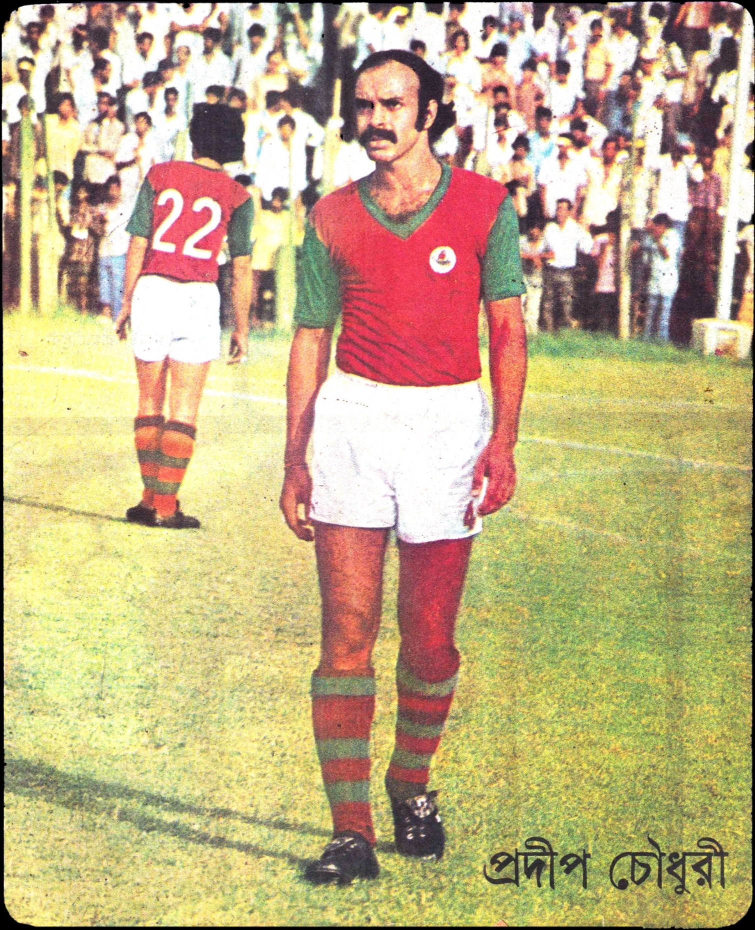
ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত ক্রীড়া-সাপ্তাহিক

খেলার আসর

২০ জুলাই ১৯৭৯





পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ সুজিত কুণ্ডু

স্ক্যান ঃ অভিজিৎ ব্যানার্জি

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

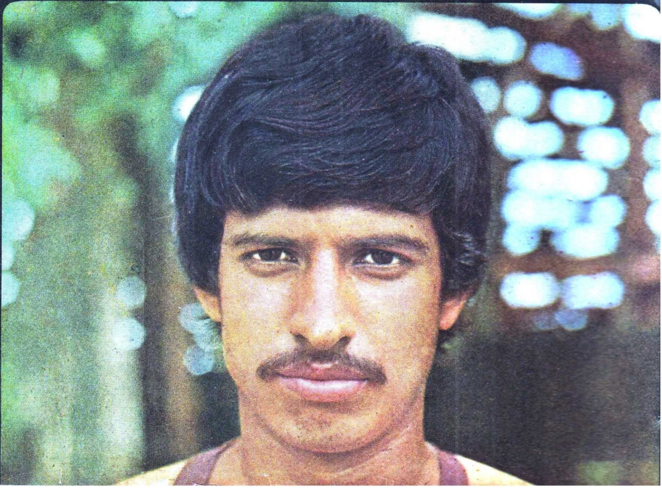
আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com



দিলীপ পাল
(খিদিরপুর)

ছবি ঃ
পাহাড়ী রায়চৌধুরী



বিশ্বজিত ভট্টাচার্য (এরিয়ান)

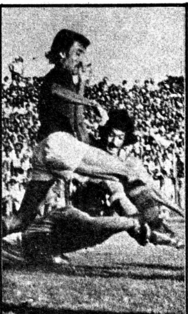
ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত ক্রীড়া-সাপ্তাহিক

খেলার আসর

বর্ষ ৩ ।। সংখ্যা ১০ ।। ২০ জুলাই ১৯৭৯

দু'সপ্তাহ আগে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের মধ্যে লিগের খেলা ড্র হয়ে যাওয়ার পর চ্যাম্পিয়নশিপের প্রসঙ্গটা তখনকার মত ধামাচাপা পড়ে যায়। কারণ দুটি দলেরই মহমেডান স্পোর্টিং-এর সঙ্গে খেলা বাকী। ইতিমধ্যে মহমেডান স্পোর্টিং মরশুমের মধ্যপথে তাদের কোচ রহমানকে দায়িত্বভার থেকে মুক্তি দিয়ে নতুন কোচের ব্যবস্থা করেছে। নানা কারণে, বিশেষ করে আভ্যন্তরীণ গোলযোগের ফলে মহমেডান স্পোর্টিং প্রায় এক দশকের বেশী কলকাতায় লিগ চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি। অথচ এক সময় তারাই ছিল কলকাতার ফুটবলের শিরোনাম। ময়দানের তৃতীয় শক্তিরূপে আজ মহমেডানের পরিচয়।

যারা মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ভেতরের ব্যাপার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, তারা জানেন যে, বছরের পর বছর এই ব্যর্থতার কারণ কি। সর্ষের মধ্যে ভূত রয়েছে। কর্মকর্তারা দু'ভাগে বিভক্ত—স্থানীয় ও বিভিন্ন রাজ্য। ভিন্ন রাজ্যের অর্থ এই নয় যে তারা ক্লাবকে ভালবাসেন না। হয়ত একটু বেশী ভালবাসেন। তবে স্থানীয় ও ভিন্ন প্রদেশের মধ্যে জল উঁচু-নীচুর ব্যাপারটি জড়িয়ে পড়ায় ক্লাব আর দাঁড়াতে পারছে না। এর ফলে কলকাতার ফুটবল বিশেষ করে ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছে।





যা আছে

ফুটবল :

লিগ পাবে কে ?/দিলীপ সরকার/২
মোহনবাগান সহজে মহমেডান স্পোর্টিংকে হারাতে পারবে না—হাবিব/শিশির ঘোষ/৪
সাত তারিখের মত একুশ তারিখের গুরুত্বও কম নয়/দিলীপ/৫
লিগের অন্য খেলায়/৪২
পাদপ্রদীপের আলোয়/হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়/৩৪
কি করে ফুটবলার হওয়া যায়/স্বরাজ ঘোষ/৯
এবার জুনিয়রদের কে কে নজর কাড়ছে/ সন্দীপ দত্ত/১০
ঢাকাতেও লোডশেডিং : ফ্লাডলিট ফুটবল বন্ধ/ আব্দুল তৌহিদ/১৮
জামশেদপুরে ফুটবল এখন তখন অবস্থায়/অমল ত্রিবেদী/২১
শিলিগুড়িতে বড় খেলার দিন/বিপ্লব তালুকদার/৮
স্কাইল্যাবে ইস্ট-মোহন/নিতাই ঘোষ/৮
গুজব না সত্যি/খবরদার/৪৪

অ্যালবামে :

চন্দ্রশেখরের প্রধান সঙ্গী ছেলে নীতিন : ছবি ডি জে আনন্দরাজ/২৪
ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ম্যাচ এবং অন্যান্য।

বিশেষ রচনা :

দমে কি মেয়েরা ছেলেদের সমকক্ষ হতে চলেছে/সুজিত সিংহ/১২
এশিয়ান ট্র্যাক অ্যাণ্ড ফিল্ড প্রতিযোগিতা : দিল্লি থেকে টোকিও ও তারপর— /অরুণ ব্যানার্জি/২৮
এ টি পি কম্পুটারে বিজয় অমৃতরাজের স্থান ৩০তম/সুব্রত সরকার/৪২

অন্যান্য :

অনেক ক্রিকেটারের আচরণ অসহ্য—আম্পায়ার টমাস ব্রুকস/নিজস্ব প্রতিনিধি/২৭
আগামী দিনের গাভাসকর/প্রদীপ বিজয়কর/৩৯
ঢাকায় ভারতীয় দাবা দলে বাংলার কেউ নেই/ হিমানীশ গোস্বামী/৪০
বাংলাদেশ ক্রীড়া লেখকদের চোখে ১৯৭৮-এর সেরা খেলোয়াড়/আব্দুল তৌহিদ/১১
আগস্টে কলকাতায় সর্বভারতীয় ওয়াটারপোলো : ট্যাংকগুলি চঞ্চল/ভুবনেশ্বর পাণ্ডে/৪৪
মস্কো '৮০ সংবাদ যোগাবে আর যোগাযোগ রাখবে 'কম্পুটার'/অতীন সরকার/৩৩
ক্লাব থেকেই স্বীকৃতি পেলাম না : শৈলজারঞ্জন রায়/সমীর ঘোষ/১৪
অদ্বিতীয় সুনীল পাণ্ডা/বিনু চ্যাটার্জি/১৬
ডি সি-র সঙ্গে চলে গেল একটা যুগও/প্রশান্ত ভট্টাচার্য/২৬
পূর্বভারত সাইকেল পোলো জিতল রাজস্থান/ নারায়ণ ওঝা/৩৯
মহিলা হকি দলের নির্বাচন/মারুফ উল হক/৪২
ছোটদের পাতা : উঠছে যারা/৪৫

এবারের প্রচ্ছদের ছবি : সমর তরফদার।

অন্যান্য ছবি : পাহাড়ী রায়চৌধুরী, অরুণ মুখার্জি, শঙ্কর নাগ দাস, হোসি মিস্ত্রি, অমিয় তরফদার, তপন রায় ও অন্যান্য।

কার্টুন এঁকেছেন : রাজা, আলি ও পিজি।



সম্পাদক : অতুল মুখার্জি

শিল্প নির্দেশক : নিতাই ঘোষ

প্রতি সংখ্যা : ১·৫০

বিমান মাশুল :
পূর্বাঞ্চলে ১৫ পয়সা, ভারতের অন্যান্য স্থানে

লিগ পাবে কারা

দিলীপ সরকার : এমন টগবগে অবস্থা লিগ লড়াই-এ আগে হয়েছিল সেই কবে, সতের বছর আগে, ১৯৬২ সালে। সেবারে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল মোহনবাগানই। ইস্ট-বেঙ্গল ও মোহনবাগান ২৮টা করে ম্যাচ খেলে উভয়েই ৪০ পয়েণ্ট সংগ্রহ করায় শেষমেষ অতিরিক্ত একটি খেলায় মিলিত হয় এবং মঙ্গল পুরকায়স্থ'র দেওয়া দুই গোলে মোহন-বাগান বিজয়ী।

উনআশির লিগ যুদ্ধে দুই প্রধানের এমন অবস্থা হবে আগে তা একদম আঁচ পাওয়া যায়নি। সুপারস্টারের ঝাঁক নিয়ে সাত জুলাই বড় লড়াই-এ ইস্টবেঙ্গল ঝড় তুলেও



পেনাল্টিতে সমরেশের গোল, অভিনন্দন-অভিনন্দনকারীকে পুলিসের তাড়া/অরুণ মুখার্জি

সাফল্য পায়নি নিছকই মন্দ ভাগ্যের জন্য। আবার মোহনবাগান আগের বারোটা ম্যাচ দাপিয়ে উতরালেও, সেদিন তাদের অবস্থা করুণ হয়েছিল শুধু কেবল খেলার প্রথমার্ধে।

দু'পক্ষকেই যে আবার মুখোমুখি হতে হবে এমন অবস্থা অবশ্য এখনও চূড়ান্ত হয়নি। বড় খেলার পরেই মোহনবাগানকে খেলতে হয়েছিল কালিঘাটের বিরুদ্ধে। যা ফি বছরই ঘটে, তাই হয়েছিল ওই খেলায়। বড় লড়াই-এর ধকলে গোটা টিমটা ধুকল প্রথমার্ধটা। কালিঘাট যদিও তেমন শক্ত বাধা দিতে পারেনি তবুও মোহনবাগান গোল পায়নি ৪১ মিনিট পর্যন্ত। মানসকে দিয়েই কেবল চাপ রাখার কৌশলটা ধোপে টেঁকেনি। পায়াস ও তপনের গোলে সট নেওয়া হয়ে ওঠেনি বহু সহজ সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও। মোহনবাগান গোল পেল তপনের বদলী রঞ্জিত মাঠে নামার পরেই। মানস, গৌতম ও পায়াস একটি করে গোল করলো সাত মিনিটের মধ্যে।

বেচারা তপনের অবস্থাটা করুণ হলো এই ম্যাচটা থেকেই। রঞ্জিত যে কটা ম্যাচ খেলেছে তাতে তার অধিকারের দাবি জাহির করেছে।

সে নিজে খেলেছে এবং সতীর্থদের খেলিয়েছে ভালভাবেই।

এখনও পর্যন্ত মোহনবাগানকে প্রদর্শনী ম্যাচে মহমেডানের বিরুদ্ধে ছাড়াও যুঝতে হবে সালকিয়া, হাওড়া ইউনিয়ন, রাজস্থান, রেলওয়ে এফ সি ও এরিয়ানের বিরুদ্ধে।

সাত জুলাই-এর পরে তাই কোচ প্রদীপ ব্যানার্জির কথা, 'আমি মহমেডানকে ভয় পাই না। ভয় অন্য দলগুলোকে।'

প্রদীপ ব্যানার্জির মস্ত অসুবিধা দলের বিভিন্ন পজিশনে বিকল্প প্লেয়ারের ঘাটতি। ভাঁড়ারে খেলোয়াড় থাকলেও কোচ কিন্তু তাদের সবাইকে লিগ ম্যাচ খেলিয়ে আজও নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি। এটা এ মরশুমে বেশী হয়েছে মোহনবাগানের পক্ষে গোড়াতেই ৩/৪টি করে গোল না হবার জন্য। বেশীর ভাগ ম্যাচেই দেখা গেছে দল গোল পেয়েছে অনেক দেরীতে। ঝুঁকি নিয়ে কোচ তাই সবাইকে খেলাবার ফুরসৎ পাননি। মোহনবাগানের সমস্যা মাঝ মাঠের খেলোয়াড় নিয়ে। গৌতম আগের মতোই খেলে যাচ্ছে। তবে ওর পাস রিসিভ করার মতো উপযুক্ত খেলোয়াড়ের অভাবটাই মস্ত সমস্যা। ট্যাকলিং-এ গৌতম ওস্তাদ। কিন্তু তার লম্বা পাস পেয়ে দু'তিন জনের পাহারায় স্ট্রাইকাররা সুবিধা করতে পারছে না। আর সব ঠিকঠাক সত্ত্বেও মোহনবাগানের প্রয়োজন গোল করার মতো একজন ভালো স্ট্রাইকার। অনবরত বল পৌঁছলেও গোলমুখে জটলা তৈরি হচ্ছে এবং সুযোগগুলোও হাতছাড়া হচ্ছে।

আগের আগেরবার গৌতমের ছোট পাস নিয়ে বল পায়ে ডিফেন্স চিরতো হাবিব, সমরেশ এবং তারও আগে মোহন সিং। যে কোনো শক্ত লড়াই-এ গৌতমই একমাত্র বেশী বল যোগাতে পারে মোহনবাগান ফরোয়ার্ডদের। কিন্তু এবারে ভালো সহযোগী না থাকায় বল একেবারে চলে যাচ্ছে গোল মুখে।

প্রসূন একরকম খেলে গেলেও আগের তেজ নেই। কোচ নবাগত স্বপন নন্দীকে খেলাবার সুযোগ পাননি। কয়েকটা ম্যাচে স্বপনকে অল্পসল্প সময় খেলতে দিলে মোহনবাগান হয়তো মাঝ মাঠের দায়িত্ব সম্পর্কে আরো বেশী নিশ্চিন্ত হতে পারতো।

মোহনবাগান অধিনায়ক দিলীপ পালিতকে ঘিরে ঝামেলাটা কম পোহাতে হয়নি। সেই ডুরাণ্ডে টিম যাবার সময় থেকেই দিলীপের সঙ্গে কয়েকজনের মন কষাকষি চলে আসছে। গোড়ায় কয়েকটা ম্যাচ খেলার পরে বেশকিছু লিগ ম্যাচে দিলীপকে খেলতে দেখা যায়নি। কিন্তু সাত জুলাই দিলীপ এতো বিক্রম দেখালো যে, ওর বিরুদ্ধে জমে থাকা অভিযোগগুলোকে জমাট রাখার চেষ্টা আর কারো পক্ষেই সম্ভব হল না। পরের ম্যাচ কালিঘাটের বিরুদ্ধেও দিলীপের খেলায় দাপট ছিল।

যাই হোক দল নিয়ে কোচ পি কে-র অনেক সমস্যা মিটলেও এখনও তিনি খুশি নন দ্বিতীয় গোলকিপার তৈরি না করতে পারায়। দেরীতে গোল পাবার একই কারণে প্রতাপের পরেই অন্য কোন গোলকিপারকে হাতের কাছে রাখার ব্যবস্থা এখনও পাকা হয়নি।

স্ট্রাইকার সমস্যা মেটাবার জন্য মোহন-বাগানের এ মরশুমে অন্তত বর্মা থেকে আসা মোহন ছেত্রীর কোন প্রয়োজন হবে না। বড়



এরিয়ানের গোলমুখে মহমেডানের সানজারি/পাহাড়ী



মোহনবাগানের মানস কালিঘাটের ক'াকনকে এড়িয়ে গোলে সট নিতে চাইছে কাছেই রঞ্জিত/অরুণ মখার্জি

ম্যাচের আগে কয়েকজন কর্মকর্তার হঠাৎ প্রচারই ছিল বোধহয় মূল উদ্দেশ্য।

প্রয়োজন মত বদলী খেলোয়াড় হাতে রাখার যে ব্যবস্থাটা মোহনবাগান এখনও করে উঠতে পারেনি, সেটা কিন্তু ইস্টবেঙ্গল সেরে নিয়েছে অনেক আগেই। কোচ অরুণ ঘোষ লিগের শুরু থেকেই দলের ভাল বোঝাপড়া গড়ে তুলতে পরিবর্ত খেলোয়াড়ের আশ্রয় নিয়েছিলেন হরদম। ম্যাচগুলোর হাল দেখে সমর্থকরা খুশি না হলেও ঠিক সময়ে প্রয়োজন মত কোথায় কাকে খেলানো যাবে তা পাকা হয়ে আছে।

ইস্টবেঙ্গল ফরোয়ার্ড লাইনে হয়ত খুব শীঘ্রই দেখা যাবে হরজিন্দারকে। দীর্ঘদিন উরুর ব্যথা ভোগ করে হরজিন্দার সম্প্রতি সুস্থ হয়েছে। একনাগাড়ে ব্যথা নিয়েও খেলে যাওয়াতেই হরজিন্দারের অসুবিধা হয়েছিল।

হরজিন্দার কোথায় খেলবে উইং না স্ট্রাইকার পজিশনে তার উপর তার ভাল খেলা না খেলা নির্ভর করছে এবং নির্ভর করছে দলের ভালমন্দও।

ঘরের এবং বাইরের খেলোয়াড়দের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম রাজনৈতিক প্যাচ ভালরকমভাবে কাজ করে যাচ্ছে, মরশুমের গোড়া থেকেই এটা যারা খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন তারা হঠাৎ করে নিরাশ হলেন সাত জুলাই-এর পরই। বড় ম্যাচের পর সমস্ত খেলোয়াড়ই একমত যে টিম মোটামুটি তৈরি। একগাদা স্টার নিয়ে যে বিপত্তি ছিল ইস্টবেঙ্গলের, সে ব্যাপারে আর কোন ভয় ভাবনা নেই। তবে চ্যাম্পিয়নশিপ পাবার পথে যে কোন গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে সুপার স্টারদের ফর্ম কতটা থাকবে বা থাকবে না সেটাই এখন একমাত্র চিন্তা।

মহমেডান স্পোর্টিং ছাড়াও ইস্টবেঙ্গলকে খেলতে হবে বেশ সতর্কতার সঙ্গে ভ্রাতৃ সংঘ, খিদিরপুর, সালকিয়া ও জর্জ টেলিগ্রাফের বিরুদ্ধে।

এদিকে মহমেডানও তৈরি হচ্ছে আবার নতুন উৎসাহ নিয়ে। কোচ রহমানসহ কিছু কর্মকর্তাকে বাতিল করা হয়েছে ক্লাব থেকে। অমল দত্তকে দেওয়া হচ্ছে কোচের দায়িত্ব। রহমানের বিদায় হতেই অধিনায়ক হাবিবও প্রতিজ্ঞা নিয়েছে—নতুন করে ভাল খেলার। দলে কে খেলবে আর কে সাইড লাইনের ধারে বসবে সে ব্যাপারে হাবিব আর একদম নাক গলাবে না।

এই লেখা প্রেসে যাবার সময়ে জানা গেছে আকবর এসে যাবে দু' একদিনের মধ্যেই। হাবিব-আকবর দুই ভাই এবারে মহমেডানের হয়ে গড়ের মাঠ কেমন মাতাতে পারবে তার উপরই মহমেডানের সাফল্য এবং মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের চ্যাম্পিয়নশিপের ভাগ্য নির্ভর করছে। অসুস্থ হয়ে হায়দ্রাবাদে পড়ে থাকা এবং প্র্যাকটিস ছাড়াই হঠাৎ করে আকবর কতটা খেলতে পারবে সেটা নিয়েও দলে কথাবার্তা হচ্ছে।

ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান ছাড়াও মহমেডানকে শক্ত লড়াই-এ সামিল হতে হবে উয়াড়ি ও টালিগঞ্জ অগ্রগামীর বিরুদ্ধে।

তবে হাবিব ছাড়া একটা ম্যাচ ভাল খেলেছিল এরিয়ানের বিরুদ্ধে। পরিচ্ছন্ন ওই খেলাটায় মহমেডান ১—০ জয় পেলেও খেলায় গতি ছিল দ্রুত এবং ফরোয়ার্ডরা আক্রমণও করেছিল খুব ভাল বোঝাপড়ায়। খেলার একমাত্র গোলটা করেছিল সমরেশ পেনাল্টি সটে। এরিয়ানের লক্ষ্মণ বেলেলের ভাল খেলা এবং মহমেডান ফরোয়ার্ডদের গোলে সট নিতে অহেতুক বিলম্ব করাটাই বেশী গোল না হবার কারণ।

লিগ কাদের ভাগ্যে জুটবে—এ প্রশ্নের হদিশ পেতে এখনও কালক্ষেপ করতে হবে। তিন প্রধানই পা ফেলবে এখন খুব সতর্ক হয়ে।

ইস্টবেঙ্গল কোচ অরুণ ঘোষের সাফ কথা —দেখা যাক কি হয়! আমরা আশা রাখি।

কোচ প্রদীপ ব্যানার্জিকে আমার মত হাজার জনকে প্রশ্নের উত্তর দিতে হচ্ছে এবং বলছেন প্রচণ্ড খুশিতে ডগমগ হয়ে। সাত জুলাই-এর পর পি কে-র কাছ থেকে অনেকেই প্রচণ্ড কাব্যিক ঢঙে জবাব পেয়েছেন 'পেতেছি সাগরে শয্যা, শিশিরে কি ভয়।'

১৩.৭.৭৯



গোল নয়—কালিঘাটের গোলমুখে জটলা, উত্তেজনা। বিপক্ষ মোহনবাগান/পাহাড়ী

মোহনবাগান সহজে মহমেডান স্পোর্টিংকে হারাতে পারবে না —হাবিব


হাবিব

শিশির ঘোষ ঃ সাতই জুলাই ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ম্যাচ ড্র হওয়ার ফলে লিগ চ্যাম্পিয়নশিপস-এর প্রশ্নে ওই দুই ক্লাবের সঙ্গে মহমেডান স্পোর্টিং-এর খেলার গুরুত্ব অনেক বেড়ে গিয়েছে। একুশে জুলাই মহমেডান-মোহনবাগানে জোর লড়াই হবে, একথা হলপ করে বলা যায়। তবে গত কয়েক বছরের ফলে দেখা যায় একমাত্র সাতাত্তরে লিগী ম্যাচ ড্র হওয়া ছাড়া মহমেডানকে প্রত্যেক বছরই মোহনবাগানের কাছে হার মানতে হয়েছে। অবশ্য গত কয়েক বছরের তুলনায় এবছর মহমেডানের শক্তি অনেক বেশী। কাজেই এবছর খুব সহজে মোহনবাগান বাধা টপকে মহমেডানকে হার মানাতে পারবে বলে মনে হয় না।

অন্তত মহমেডান অধিনায়ক মহম্মদ হাবিব বা অন্যান্য কর্মকর্তাদের তাই অভিমত। তবে মোহনবাগানের দলগত শক্তিকে হাবিব কখনই অবজ্ঞা করতে রাজী নন। মোহনবাগান-মহমেডান খেলার ঠিক দশদিন আগে মহমেডান তাঁবুতে হাজির হয়েছিলাম হাবিবের সঙ্গে কথা বলার জন্য। হাবিব তখন দলের কোচিং এবং নিজের প্র্যাকটিস সেরে (কারণ ৫ জুলাই-এর এক সভায় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে ক্লাব কোচ রহমানকে কর্তারা বরখাস্তের নোটিশ ধরিয়ে দিয়েছিলেন) সাধারণ সম্পাদক ইশ্‌রার আমেদসহ কয়েকজন সদস্য পরিবেষ্টিত অবস্থায় নাস্তা সারছিলেন।

হাবিবের কাছে সরাসরি ২১ জুলাই ম্যাচের ফল সম্বন্ধে অভিমত জানতে চাওয়ায় জবাব দিলেন ঃ 'ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান এক পয়েন্ট করে নষ্ট করায় লিগে আমাদের সামনে একটা সুযোগ এসেছে। জিতব, এমন কথা হলফ করে বলা সম্ভব নয়, তবে আমরা জেতার জন্য লড়াই করব—একথা নিশ্চয়ই বলতে পারি। আমাদের টিমের মেণ্টাল কন্‌ডিশন খুবই ভাল এবং টিম স্পিরিট খুবই হাই। কাজেই টেনশনে না ভুগে টিম ইজি খেলবে বলেই আমার ধারণা। তাছাড়া আমাদের ইয়ং এবং স্কিল্ড প্লেয়াররা ভাল ফাইট দেবে দেখবেন।'

'তবে মোহনবাগান খুবই ভাল টিম। বিশেষ করে খুব বেশী খেলোয়াড় দল না ছাড়ার জন্য ওরা বেস্ট সেট টিম। অফেন্সে দুটো উইঙ্গার খুবই ফাস্ট এবং ভালই খেলছে, লিঙ্কম্যান দুজন ভাল, ব্যাক লাইন এবং গোলকিপারও ভাল। কাজেই এ ম্যাচ সম্বন্ধে আগেভাগে ফোরকাস্ট করা চলে না।'

আকবরের কলকাতা আসা এবং খেলার সম্ভাবনার বিষয়ে জিজ্ঞেস করাতে হাবিব জানালেন, 'আকবর একদম ফিট, এখন এক্সারসাইজ করছে। ওকে তৈরি থাকতে বলেছি, প্রয়োজনে যেন চলে আসে। তবে সঠিক কিছু বলতে পারছি না।'

প্রশ্ন রেখেছিলাম, মহমেডানের জার্সি পরে মোহনবাগানের পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামলে মনে কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে কিনা? এর উত্তরে হাবিবের জবাব 'একসঙ্গে খেলা এবং রাত কাটানোর সুবাদে মোহনবাগানের অনেক প্লেয়ারই আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কিন্তু মাঠে নামলে বন্ধু কেউ নেই। অন্য রঙের জার্সি গায়ে সকলেই আমার প্রতিদ্বন্দ্বী এবং তখন আমার মূলমন্ত্র—ফাইট। এই সততাকে মূলধন করেই হাবিব মিঞা গত চোদ্দ বছর লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। আমাকে যারা দেখছে তারা কেউই নিশ্চয়ই এ কথাটা অস্বীকার করবে না।'

লিগের মাঝখানে হঠাৎ কোচ চলে যাওয়ায় প্লেয়ারদের মনে কোনও প্রতিক্রিয়া হবে কিনা? উত্তরে হাবিবের বক্তব্য 'কোচ রহমান কখনই আমাদের পুরো সময় দেননি। কাজেই কোচ চলে যাওয়ায় প্লেয়ারদের মনে কোনও প্রতিক্রিয়া হবে মনে হয় না। এই প্রসঙ্গে আমার আর একটা কথা বলার আছে। যিনি কোচ হোন না কেন, তাকেই আমি মানবো এবং শ্রদ্ধা করব। রহমন সাহেবকে হাত জোড় করে সেকথা আমি বলেছিলাম। কিন্তু কিছু কাগজে আমাদের দুজনকে জড়িয়ে নানান গল্প বের হয়েছে বিভিন্ন সময়ে, যার জন্য আমি খুবই লজ্জিত।

আরও একটা বিষয়ে আমি খুবই লজ্জিত এবং দুঃখিত। তা হল রেফারির হলুদ কার্ড দেখানো এবং ম্যাচ সাসপেনশনের প্রশ্নে। এক যুগেরও বেশী আমি বাংলা দলে খেলেছি এবং ট্রফি জিতে এনেছি, ভারতীয় দলে খেলেছি এবং বহুক্ষেত্রে দেশের সম্মান রেখেছি। এখন এই মাঠ থেকে বিদায় বেলায় কেন এই অপমান বলতে পারেন। বড়জোর আর দু'এক বছর খেলব।'

'কিরে, তুই আরও দু'এক বছর খেলবি, তাহলে আমিও খেলব। অবশ্য যদি মহমেডান তাড়িয়ে না দেয়।' আমাদের কথার মাঝে দই-এর ভাঁড় হাতে সমরেশ চৌধুরী এসে দাঁড়িয়েছে দই সম্বন্ধে ক্যাপ্টেন হাবিবের কাছে অনুযোগ করতে। সঙ্গে সঙ্গে ক্যান্টিনের লোকদের ডেকে দাবড়ানি দিয়ে দিলেন হাবিব।

একুশ তারিখের খেলা সম্বন্ধে সমরেশকে প্রশ্ন করায় উনি বললেন, 'হলফ করে কি কিছু বলা যায়?' সমরেশ আরও কিছু ঠাট্টা তামাশা শুরু করেছিলেন। কিন্তু হাবিব তাকে থামিয়ে নিজের কথায় ফিরে গেলেন।

'গতবছর নিজের জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গায় অত ভাল খেললাম। সব খেলারই প্রশংসা হত কাগজে কাগজে। এমনকি এক কাগজ লিখে বসল 'কিং অফ ময়দান'। কিন্তু সন্তোষ ট্রফিতে বাংলা দলে জায়গা পেলাম না। আই এফ এ কর্মকর্তারা ছাড়াও এখন মনে হয় রেফারিরাও বোধহয় আমার পিছনে পড়েছে। কি দোষে কার্ড দেখানো বা ম্যাচ থেকে সাসপেণ্ড করা হল জানি না। কোনও কিছু জিজ্ঞেস করলে রেফারি কার্ড দেখাচ্ছে। ৬ জুলাই শুক্রবার বিকেলে ইস্টার্ন রেলের সঙ্গে খেলা হল। পরদিন ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ম্যাচ। আই এফ এ-র সমস্ত কর্মকর্তা তখন শশব্যস্ত, তারই মধ্যে সময় করে কখন লিগ কমিটি মিটিং করে আমাকে খেলা থেকে সাসপেণ্ড করলেন জানি না। শনিবার তিনটের মধ্যে আমাকে সেই চিঠি ধরানো হল। আমাকে শাস্তি দিতে সকলেই খুব তৎপর দেখছি। আমাদের এই নরম কর্মকর্তাদের সুযোগ সবাই নিচ্ছে।'

আমার ব্যক্তিগত অনুরোধ—'দোষ যদি করে থাকি আমাকে ডেকে বলুক কি আমার দোষ? অশোকদা (আই এফ এ সম্পাদক অশোক

ঘোষ) আমার কান ধরে বুঝিয়ে দিন কি আমার দোষ, কিন্তু বিদায় বেলায় বদনাম না করলেই নয়! বাংলাকে তো আমি কিছু কম দিইনি, তবে কেন আমার এই অসম্মানের পুরস্কার পাওয়া ?' বলতে বলতে হাবিবের গলা ভারী হয়ে এল।

পরিস্থিতি সামাল দিলেন সমরেশ। 'দূর, ওসব কিছু নয়। রেফারি রবি চক্রবর্তী তোর ওপর পুরনো রাগের ঝাল মেটাচ্ছে। জানেন তিয়াত্তর সালে হাবিব তখন ইস্টবেঙ্গলে। খিদিরপুর ম্যাচে হাবিবকে মার্চিং অর্ডার দেওয়ার জন্য সমর্থকরা রবিবাবুর বাড়ি চড়াও হয় এবং রবিবাবু বেশ কয়েকমাস বাড়ি ছাড়া ছিলেন। পরে অবশ্য হাবিবের জন্যই ঝঞ্ঝাটের অবসান হয়েছিল। রবিবাবু লঘু পাপে গুরুদণ্ড দেওয়ায় আমার মনে হচ্ছে রবিবাবু সেই ঝাল মিটিয়ে নিলেন।'

শুনেছিলাম হাবিব নাকি মহীন্দ্র অ্যাণ্ড মহীন্দ্র কোম্পানিতে চাকরি নিয়েছেন। রটনার সত্যতা স্বীকার করে হাবিব জানালেন, কোচ-কাম-প্লেয়ার হিসাবে হাবিব ওই কোম্পানিতে যোগ দিয়েছেন। খেলা ছাড়ার পর হাবিব কোচ হিসাবে কলকাতায় থাকবেন কিনা জিজ্ঞেস করাতে হাবিব শিউরে উঠে বললেন 'কক্ষনো না। দেশ, মা-ভাই-বোন ছেড়ে ফুটবল খেলতে এসে যথেষ্ট গালাগালি খেয়েছি। আর চাই না। খেলা ছাড়লেই সটান বাড়ি ফিরব।'

ওখানেই সাধারণ সম্পাদক ইশরার আমেদের মুখ থেকে শুনলাম —সালাম বা ইউসুফ নয়, অমল দত্তর সঙ্গে কথাবার্তা পাকা হয়ে গিয়েছে এবং দু' একদিনের মধ্যেই তিনি দলের ভার নেবেন। এই ঘটনার পর থেকেই সদস্য এবং কর্মকর্তারা একুশে জুলাই ম্যাচ সম্বন্ধে আশাবাদী হয়ে উঠেছেন।

এর দিন কয়েক আগে রহমানের সঙ্গে মধ্য কলকাতার এক রেস্তোরাঁতে দেখা হয়েছিল। দেখা হতেই রহমান প্রথম কথা বলেছিলেন, 'শুনেছ বোধহয় আমি কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছি, কারণ ক্লাব আমাকে বরখাস্তের নোটিশ ধরিয়ে দিয়েছে। এমনকি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মেস ছেড়ে চলে যেতে বলেছে।' আমি তিন চারজন প্লেয়ারকে সঙ্গে নিয়ে চলে যাব। যাদের ছেড়ে যাব,—জানি না তাদের কার ভরসায় রেখে যাব। আমার সামনেই সম্পূর্ণ ফিট থাকা সত্ত্বেও নাজীব, দীনকর, ফিলিপকে বসিয়ে রেখে চোট খাওয়া প্লেয়ারকে খেলানো হয়েছে। ওরা আমার প্রাণ। কিন্তু কয়েকজন লোকের কথায় বিশ্বাস করে আমিই ওদের সর্বনাশ করলাম। ক্লাব সভাপতি আজিজ সাহেব নিজে আমাকে ডেকে এনে টিমের ভার দিলেন, এখন তারাই আমাকে বিদায় করে দিচ্ছেন। এমনকি, কথামত টাকা পয়সা পর্যন্ত দিচ্ছেন না। কি কুক্ষণেই টিম কোচ করার শখ আমার মনে জেগেছিল। আজ তারজন্যেই এই অসম্মান। কলকাতার ফুটবলপ্রেমীরা যেন এর বিচার করেন।'

পরে একজন কর্মকর্তার কাছে শুনেছিলাম ৫ জুলাই এক সভায় ক্লাব-শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে সানজারিকে সাসপেণ্ড করলে কেউ কেউ রহমানের বিরুদ্ধেও শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ তোলেন। কর্মকর্তারা এক যোগে রহমানকেও শাস্তি দিতে বদ্ধপরিকর হলেন। তারই পরিণতি—রহমান বরখাস্ত হলেন। ওই একই সভায় ক্লাব আর একটি প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম করলেন সভাপতির বদলে ক্রিকেট সম্পাদক সিদ্দিকীকে সি এ বি-তে ক্লাবের প্রতিনিধি মনোনীত করে। তখন নতুন কোচের খোঁজে কেউ কেউ সালাম এবং ইউসুফের নাম করেন। কিন্তু সালাম বাঙ্গালোরে এন আই এস-র ফুটবল কোচ এবং ইউসুফও সরকারী কর্মচারী। কাজেই তাদের পক্ষে হঠাৎ আসা সম্ভব না হতে পারে ভেবে অমল দত্তকে অনুরোধ করা হবে বলে সাব্যস্ত হয়। অমল দত্ত এই প্রস্তাবে রাজী তবে চূড়ান্ত চুক্তি এখনও (এই লেখা প্রেসে যাওয়া পর্যন্ত) হয়নি; জানালেন মহমেডানের সাধারণ সম্পাদক ইশরার আমেদ। দেখা যাক, কোচ হিসাবে মহমেডানের বহু আলোচিত অশান্তি মিটিয়ে শক্ত হাতে হাল ধরে অমল দত্ত মহমেডানকে লিগ যুদ্ধে জয়ী করতে পারেন কিনা!

সাত তারিখের মত একুশ তারিখের গুরুত্বও কম নয়—দিলীপ

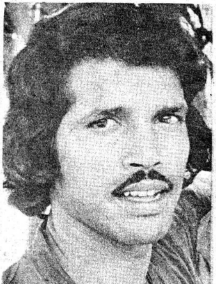
'এ মরশুমে কোন খেলাকেই ছোট খেলা বলা যায় না। আমরা সেরকমভাবে ভাবিও না। ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে আমাদের খেলা বড় খেলা। তার গুরুত্বও যথেষ্ট। তাই বলে অন্য যে কোন খেলার গুরুত্বও কম নয়। সে ক্ষেত্রে মহমেডানের সঙ্গে খেলাটাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।'

মোহনবাগান : মহমেডান স্পোর্টিং-এর খেলার সপ্তাহখানেক আগে মোহনবাগান অধিনায়ক দিলীপ পালিতের সমীক্ষা এই। ওর বক্তব্য—সাত জুলাই এর খেলা অমীমাংসিত থাকায় মহমেডানের সঙ্গে খেলার গুরুত্ব আরও বেড়ে গেছে। এটা যেমন সবাই বুঝতে পারছেন আমরাও তা বুঝতে পেরে ওই ম্যাচকে মোহনবাগান : ইস্টবেঙ্গল ম্যাচের থেকে কোন অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি না। ৭ তারিখ ও ২১ তারিখ দুটো ম্যাচই সমান গুরুত্বপূর্ণ।'

ফল কি হবে ? এ প্রশ্নের উত্তর দিলীপ সরাসরি দেয়নি। ওর বক্তব্য—দেখুন না কি হয় ? তবে কোন অঘটনের আশঙ্কা করছি না।'

'মহমেডান কেমন খেলছে ?

'আমি তো ওদের খেলা দেখিনি, তবে হাবিবদা আছে, আকবরও নাকি সুস্থ হয়েছে, যদি খেলতে পারে তবে নিশ্চয়ই ভাল খেলবে। আর পিণ্টুদা তো আছেই।'



দেখুন না কি হয়—দিলীপ

'মোহনবাগান কেমন খেলবে ?'

'আমাদের তো সবই ঠিক আছে। এমন কি স্ট্রাইকারও ভাল। কিন্তু একটা জিনিস আমার মনে হয়েছে একটু সাহসভরে ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে খেললে দল আরও অনেক গোল পাবে। এটা তো ঠিকগোল অ্যাভারেজে আমরাই সবার আগে। এবং এই গোলের মধ্যে বেশীরভাগ গোলই করেছে আমাদের স্ট্রাইকাররা। সুতরাং আমাদের পুরোভাগ দুর্বল এ কথা বোধহয় ঠিক নয়। ওই যা বলেছি—প্রয়োজন সাহস ও আত্মবিশ্বাস।'

কথা প্রসঙ্গে সাত তারিখের ম্যাচের কথা বলল দিলীপ—'প্রথমার্ধে ওরা ভাল খেলেছে অবশ্যই, কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে আমরা তো খারাপ খেলিনি। গোলও পেতে পারতাম।'

'যদি এই খেলাটা আবার খেলতে হয়।'

'কি আছে! খেলব। এবং ভাল খেলার চেষ্টা করব। তার থেকেও বড় কথা ইস্টবেঙ্গলের থেকে ভাল খেলার চেষ্টা করব।'

পবিত্র দাস



মোহনবাগান ঃ ইস্টবেঙ্গল—বল নিয়ে দেবরাজ ও বিদেশ/শংকর

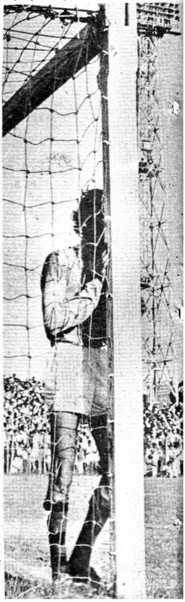


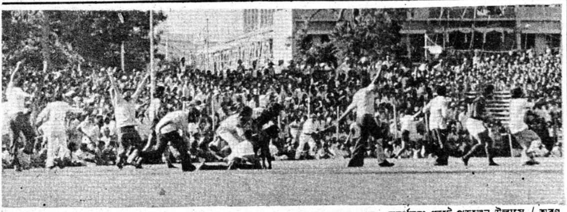
মানসের অসাধারণ গোল—পায়াস, সুব্রত, গৌতম, শ্যাম থাপা ছুটে এলো তাকে অভিনন্দন জানাতে / পাহাড়ী



সাত জুলাই ময়দানে মহারণ

সাত জুলাই—প্রতাপ ঘোষ দ্বিতীয়ার্ধে মাঠে নেমেই— / পাহাড়ী





গো-ও-ল—মোহনবাগান গোল পেল—সমর্থকরা ফেটে পড়লেন উল্লাসে / অরুণ

সাত জুলাই-এর পি কে-র পরিকল্পনা—মোহনবাগান খেলোয়াড়রা বুঝে নিচ্ছে/অরুণ মুখার্জি





তের বল নিয়ে লড়াই, মিহির-সুব্রত / শাহাজী



শনিবারের লড়াই কেন্দ্র—মোহনবাগান মাঠের প্রবেশদ্বার, খেলার দিন সকালে / অরুণ

ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান



লড়াই শেষে দুই অধিনায়ক—হাতে হাত, মাঝে ডেভিড—কিন্তু পুলিশ কেন?



মোহনবাগান গোলমুখে মিহিরের প্রয়াস / শাহাজী

ইস্টবেঙ্গলের গোল-- ইস্টবেঙ্গলের উৎফুল্ল সমর্থক ও কর্মকর্তারা /শংকর



কোচ অরুণ ঘোষ কি চান ৬ তারিখে সকালে তা বোঝাচ্ছেন খেলোয়াড়দের/অরুণ মুখার্জি



শিলিগুড়িতে বড় খেলার দিন

বিপ্লব তালুকদার

সাতই জুলাই ভারতের সমস্ত অঞ্চলের সঙ্গে শিলিগুড়ির অসংখ্য ইস্ট-মোহন সমর্থকরাও নিজেদের সামিল করেছিলেন উত্তেজনার মিছিলে।

শিলিগুড়ির সব রাস্তায় এবং অলিতে গলিতে ছিল লাল-হলুদ পতাকার প্রাচুর্য। এ দৃশ্যতে খুব স্পষ্টভাবে চিহ্নিত হয়েছে যে, এখানে ইস্টবেঙ্গলের সমর্থক বা তাদের সামর্থ্য বা উন্মাদনা মোহনবাগানের সমর্থকদের থেকে অনেক বেশী। এদিন সব থেকে সুসজ্জিত ছিল সুভাষপল্লী এবং জি টি এস মোড়।

বড় খেলার ফলাফলে দু'দলের সমর্থকেরাই অখুশী। সমানভাবে পটকা ফাটিয়েছেন দু'পক্ষই। খেলা শেষ হবার কিছুক্ষণ পরেই লাল হলুদ পতাকা নিয়ে একখানা ট্যাক্সির মাথায় অ্যামপ্লিফায়ার লাগিয়ে ওয়েস্টার্ন মিউজিকের রেকর্ড বাজিয়ে যাবার সময় মোহনবাগানের সমর্থকেরা হো হো করে আওয়াজ দিয়ে উঠেছিল।

সন্ধ্যা সাতটায় নামলো মুষলধারে বৃষ্টি। বৃষ্টি ভেজা শহরের প্রধান রাজপথ হিলকার্ট রোডে দেখলাম কোন পক্ষেরই মাতামাতি নেই। সারাদিন ধরে সমস্ত বাঙলার সাথে যে শিলিগুড়ি উত্তেজনার ধকল সয়েছে খেলার ফলাফল তাকে নিস্তেজ করে দিয়েছে।

বৃষ্টি ভেজা শহরকে দেখে মনেই হচ্ছে না যে কয়েকঘন্টা আগে এই শহরটিও আশা নিরাশা আর উত্তেজনার পসরা সাজিয়ে মেতেছিল। বড় খেলার পরে কিছু কিছু উত্তেজনা দেখেছি বিভিন্ন পাড়ার বিক্ষিপ্ত জটলাতে। কেউ বলেছেন সমস্ত খেলাটাই 'গট আপ কেস'। কারও মতে 'হতেই পারে না'। তবে কেউ অবশ্য চড়া গলায় কথা বলতে পারেন নি। কারণ সম্মান লড়াইয়ের দাঁড়ি-পাল্লায় এবার দু'পক্ষের ওজনই সমান সমান।



শিলিগুড়িতে অফিস ফুটবল

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ি পোস্ট অ্যাণ্ড টেলিগ্রাফস ফুটবল প্রতিযোগিতা উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সম্প্রতি শেষ হয়েছে। এ বছরের প্রথম প্রতিযোগিতাতে টেলিস্টার, টি আর এ, এস ডি ও ফোনস, রেস্ট একাদশ, আর এম এস, সার্কেল স্টোর ডিপো, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, ট্র্যান্সমিশন ও ডিপার্টমেন্টাল টেলিগ্রাম একাদশ অংশ নিয়েছিল।

সেমিফাইনালে পোস্ট অফিস ৫—০ গোলে আর এম এস কে, রেস্ট একাদশ ২—০ গোলে ট্র্যান্সমিশনকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে। ফাইনাল খেলায় পোস্ট অফিস ৩—২ গোলে রেস্ট একাদশকে হারিয়ে বিজয়ী হয়। খেলা শেষে পুরস্কার প্রদান করেন ডি ই টি এস সি লোধ।

স্কাইল্যাবে ইস্ট-মোহন

নিতাই ঘোষ

স্কাইল্যাব, স্কাইল্যাব চারিদিকে হৈচৈ
পড়লেই কিছু লোক মরবে।
যত নিচে আসবে, গতি তত বাড়বে
কিছু কিছু টুকরো ঝরবে।
পৃথিবীর ঘুম নেই, জেগে রয় সারারাত
স্কাইল্যাব এই বুঝি পড়ল।
জানি না কে বাঁচাবে, তুক-তাক মাদুলী ?
জীবনবীমাটা শেষে করল।
সারারাত ভাবছি। এ আবার হল কি ?
অসময় কেন ওটা নামছে।
ঠিক রাত বারটা, ফিস্‌ফিস্‌ শব্দ।
শুনে যেন শরীরটা ঘামছে।
এত রাতে ওরা কারা! কি কথা বলছে
চুপিচুপি কান পেতে শুনছি।
আর কিছু বললে ফটাফট্ লিখব
সময়টা বসে বসে গুনছি।
কানে এল কটা কথা, শুনলাম আবছা,
ভাবলাম হবেও বা সত্যি
খেলার নিউজটা—রিলে করা হয়েছে
খবরটা পেয়েছে একরত্তি
গুঁড়ি মেরে উঁকি দিই ওপরের ছাদটায়
'খেলার আসর' কারা পড়ছে
দেখি সেই যন্ত্রটা ; তাতে দুই যন্ত্রী
ইস্ট-মোহন নিয়ে লড়ছে।



কি করে ফুটবলার হওয়া যায় (৫)

স্বরাজ ঘোষ : ফুটবল খেলাকে কেন 'অ্যাথলেটিক গেম' বলে এবং তার মর্মার্থ কি —এই প্রশ্ন সকলের মনেই আসাটা স্বাভাবিক। আমি আগেই লিখেছি 'শিক্ষার্থীর জীবনের সুষম বিকাশ।' শিক্ষার্থীকে সঠিক ধারণা দিতে হয়। সেইভাবে তারা পরিচালিত হতে পারলেই শিক্ষাদান হয় মর্মস্পর্শী ও কার্যকরী।

ফুটবলার হতে হলে জীবনের প্রথম থেকেই অ্যাথলেটিক্স শুরু করে দিতে হবে। অ্যাথলেটিক্সে যে সমস্ত বিষয় আছে, তার সব কটিই প্রায় ফুটবল খেলার জন্য প্রয়োজনীয়। যেমন স্প্রিন্টিং অর্থাৎ সর্বশক্তি ঢেলে পূর্ণ বেগে দৌড়। সেটা থ্রু বল পাবার উদ্দেশ্যেই হোক বা উইং দিয়ে বল নিয়েই হোক অথবা ১০-১৫ গজ ছোট দৌড়ই হোক। হয়তো খেলার পরিস্থিতি অনুযায়ী ওই সময় কোন খেলোয়াড় একেবারে দাঁড়ানো অবস্থায় আছে, হঠাৎ বলটা এসে গেল। তখন পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী দাঁড়ানো অবস্থা থেকেই পূর্ণবেগে বলকে নিয়ে দৌড়নো দরকার। যার স্প্রিন্ট করার ক্ষমতা নেই সে আর পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারে না। এখানে আরেকটা কথা বলে রাখা ভাল। তা হল, ফুটবল খেলার দৌড় আর অ্যাথলেটিক দৌড় এক নয়। অ্যাথলেটিক দৌড় হল একটানা দৌড়। কিন্তু ফুটবলের দৌড় হল বলের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্ক রেখে অতর্কিতে আবার ব্রেক্ দিতে হয় ও বহুমুখী দৌড়। ইংরেজীতে বলে 'রান এ্যাণ্ড ব্রেক' করে স্প্রিন্ট টানতে হয়। বড় হলে জানবে এই ব্রেকের ইংরেজী শব্দার্থ হল 'রিটার্ডেশন।' কাজেই রিটার্ডেশন ও স্প্রিন্টের সঙ্গে বলের সংযোজন করাটাই হল ফুটবলের প্রয়োজনে অ্যাথলেটিক স্প্রিন্টের প্রয়োজন।

এবার জেনে রাখো, দৌড়ের সময় দুই পায়ের কি কাজ। সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখবে তুমি ফুটবল খেলোয়াড়। দুই পায়ের অঙ্গুলি অর্থাৎ 'টো'-এর উপর নির্ভর করে স্প্রিন্ট করতে হয়। এক পা মাটি টানছে, আরেক পা মাটি ঠেলছে। সামনের পা মাটি টানছে, আর পেছনের পা মাটি ঠেলছে। যাকে ইংরেজী ভাষায় বলে 'পুল ও পুশ'-এর সমন্বয়ে দৌড়। এই প্রসঙ্গে আরেকটা কথা জেনে রাখো—স্প্রিন্ট অনুশীলন করার সময় শক্ত মাটিতে করবে, নরম মাটিতে মোটেই নয়। সম্ভব হলে কাঁটাওয়ালা রানিং সু (স্পাইক) হলেই ভাল হয়। স্টার্ট নেবে যখন, তখন যেন অ্যাথলেটিক স্প্রিন্টিং স্টার্ট অর্থাৎ দুই হাঁটু মুড়ে, ডান হাঁটুর সমান্তরাল বাঁ পা-কে 'টো'-এর উপর ভর করে মাটিকে পুশ করার মত না করে দাঁড়ানো অবস্থায় এক পা এগিয়ে ও এক পা পিছিয়ে রেখে একটু কুঁজো হয়ে স্টার্ট নেবে। কারণ ফুটবল খেলা তো। আর মনে রাখবে, দুই হাত হল দুই ডানা। ওই দুই হাতের উপর সব ব্যালান্স নির্ভর করছে। ছবিটি দেখলেই বুঝতে পারবে। তবে মাথা যেন জার্ক করতে করতে দৌড়তে না হয়। জার্ক হলেই স্পিড কমে যাবে। আর দৌড়বার সময় মনে রাখবে সামনের পায়ের অবস্থান যা হবে পেছনের পায়ের অবস্থান ঠিক সেইভাবেই হবে। ছবিটি দেখলেই বুঝবে। আর দৌড়বার সময় শরীরের কোন অঙ্গ যেন না দোলে। ঘাড় ও কোমর, মাথা থেকে পা অবধি এক লাইনে হয়ে যাবে। আর ছবির মত মাথা উঁচু করে দৌড়বে। কারণ ফুটবল খেলা। মাথা উঁচু রেখে বল নিয়ে দৌড়তে হবে। তা না হলে দৌড়বার সময় সামনের পরিস্থিতি নজরে আসবে না। সাবধান। জীবনের প্রথম লগ্ন থেকেই যদি বেশী ঝুঁকে দৌড়বার প্রবণতা জন্মে যায়, সেটাই অভ্যাসে পরিণত হয়। আর খেলার সময়ও মাথা নীচু করে দৌড়বার প্রবৃত্তি থেকে যায়। তার ফলে মাথা উঁচু করে খেলবার ক্ষমতা হারিয়ে যায় ও সম্মুখ পরিস্থিতি নজরে আসে না। কাজেই বহু সুযোগ নষ্ট হয়ে যায়।

আজ তোমরা আধুনিক ফুটবলের একটা মুখরোচক কথা শোন। সেটা হল—'ওভার ল্যাপ' শব্দ। জেনে রাখো স্প্রিন্টিং ক্ষমতা না থাকলে 'ওভার ল্যাপ' করা যায় না। ওভার ল্যাপ শব্দটাই হল অ্যাথলেটিক শব্দ।

আবার জেনে রাখ, ওভারল্যাপ আর ওভার টেক এক কথা নয়। তোমরা কিন্তু ওভারল্যাপ আর ওভার টেক জিনিসটা দেখে বুঝতে পারবে না, বড় হলেই বুঝবে। ওভারল্যাপ হল এক অঞ্চল থেকে সামনের অঞ্চলগুলোতে চলে যাওয়া। আর ওভার টেক হল দৌড়ানো অবস্থায় সামনের খেলোয়াড়কে বাড়তি বেগ দিয়ে অতিক্রম করে যাওয়া। ওভারল্যাপ করতে হলে তার দুটো ক্ষমতা একসঙ্গে থাকা চাই। সেটা হল সোজা স্প্রিন্ট ও যে উদ্দেশ্যে ওভার ল্যাপ করা হল, কাজটি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বস্থানে ফিরে যাবার জন্য 'রি-স্প্রিন্ট'। কিন্তু স্বস্থানে ফিরে যাবার সময় বলকে পেছনে রেখে দৌড়লে বিপদের সম্ভাবনা থাকে। ফুটবল বিজ্ঞানে বলে 'ফেসিং দ্য বল' অর্থাৎ বলকে নজরে রেখে স্বস্থানে ফিরে যেতে হয়। তা না হলে ওই সুযোগ বুঝে প্রতিপক্ষ আক্রমণ করে দেবে। সঙ্গে সঙ্গে বিপদ নেমে আসবে। তোমরা কিন্তু বলকে নজরে রেখেই 'রি-স্প্রিন্ট' করবে। অর্থাৎ ব্যাক স্প্রিন্ট অভ্যাস করবে।



ছবিটি ১৯৪৮ সালের লণ্ডন ওলিম্পিকের ১০০ মিটার দৌড়ে বিজয়ী হ্যারিসন (ডোন্‌স) ডিলার্ডের দৌড়নো অবস্থায় তোলা। তিনি ১৯৫২ সালে হেলসিঙ্কি ওলিম্পিকে ১১০ মিটার হার্ডলসে বিজয়ী হন। ছবিটি দৌড়বীরদের জন্য একটা আদর্শ প্রতীক। প্রত্যেক ফুটবলারের এই ছবি দেখে দৌড়নো ভঙ্গিমা থেকে আরম্ভ করে দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি অনুসরণ করার মত।

এবার বুঝতেই পারছ শিক্ষিত খেলোয়াড় হওয়া কত সাধের ব্যাপার। কাজেই ধৈর্যের দরকার। একটা দৌড়ের ব্যাখ্যা করতেই কত কথা এসে গেল। তারপর বোঝাবো কোনটা কিকিং পা আর কোনটা নন্-কিকিং পা। সামনের পা-কে কি বলে আর পেছনের পা-কে কি বলে। কোন পা দিক নির্ণয়ে সাহায্য করে আর 'ল্যাণ্ডিং' পা কাকে বলে, তার ফর্ম কি ইত্যাদি। 'টার্নিং' কি করে করতে হয়। তবে মনে রেখো ওইসব অলঙ্কারগুলো 'অ্যাথলেটিক' কার্যকলাপ বাদ দিয়ে নয়। পরের সংখ্যায় জানাতে চেষ্টা করব, কোন্ কোন্ পজিসনের খেলোয়াড়ের কোন্ কোন্ অ্যাথলেটিক বিষয়বস্তু রপ্ত করা দরকার।

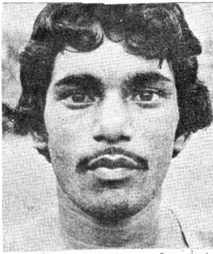
(চলবে)

[ফুটবল সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন থাকলে 'খেলার আসরে'র ঠিকানায় স্বরাজ ঘোষের নামে চিঠি লিখতে পারেন—সম্পাদক]।

এবার জুনিয়রদের কে কে নজর কাড়ছে

সন্দীপ দত্ত : এই মুহূর্তে যে কজন উঠতি, টগবগে উইং ফরোয়ার্ডদের নিয়ে কলকাতার দর্শকরা আগামী দিনের আশায় চিন্তা ভাবনা চালাচ্ছেন তাদের মধ্যে টালিগঞ্জ অগ্রগামীর রাইট আউট রঞ্জন ঘোষের নামটা বেশ ওপরের দিকে। পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি উচ্চতার রঞ্জনের বড় মূলধন ওর গতিবেগ। যার সাহায্যে ও খুব তাড়াতাড়ি বিপক্ষ গোলমুখে পৌঁছে যেতে পারে। স্পট জাম্প ভাল। সুতরাং দেখতে ছোটখাট হলেও হেড করতে অসুবিধা নেই। গোলে সটও নিতে পারে চটপট। এখন পর্যন্ত গোল পেয়েছে ২টি। বল কন্ট্রোল মোটামুটি থাকলেও মুভমেণ্টের সময় বল রিসিভিংয়ের দিকে জোর দিতে হবে এবং আত্মবিশ্বাস নিয়ে খেলতে পারলে রঞ্জন যে কোন ডিফেন্স লাইনের কাছে ভয়ের কারণ হয়ে উঠতে পারে।

নাকতলার এই কুড়ি বছর বয়সী ছেলেটি ছোটবেলায় পাড়ার আর পাঁচটি ছেলের সঙ্গে বল নিয়ে দাপাদাপি করলেও আধুনিক ফুট-বলের প্রথা প্রকরণের সঙ্গে পরিচিত হয় বছর পাঁচেক আগে অ্যাভিন্যু সম্মিলনীর কোচ অশোক গুহর মাধ্যমে। খুব অল্পদিনের মধ্যে ফুটবলের প্রাথমিক মারপ্যাঁচগুলি আয়ত্ত করে সেবছরই দ্বিতীয় ডিভিসন দল ইয়ং বেঙ্গলে যোগদান সূত্রে ময়দানে খেলতে আসে। একই বছরে নাকতলা হাইস্কুলের হয়ে দক্ষিণ কলকাতা জেলা স্কুল লিগে খেলেছে। পরের বছর ইস্টবেঙ্গল দলের অধিনায়ক প্রশান্ত ব্যানার্জির কথায় রঞ্জন পাইকপাড়া কুমার আশুতোষ ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হয়। সেবার দিল্লিতে নাগাল্যাণ্ড স্কুল দলকে ৩-২ গোলে হারিয়ে সুব্রত কাপ জয়ী হয় কুমার আশুতোষ। সেসময় রঞ্জন স্কুলের নিয়মিত খেলোয়াড় ছিল। গোটা প্রতিযোগিতায় গোল করেছিল ৪টি। '৭৬-এ রঞ্জনের অধিনায়কত্বে কুমার আশুতোষ সুব্রত কাপের ফাইনালে আগরপাড়া নেতাজী শিক্ষায়তনের কাছে নামমাত্র গোলে হেরে রানার্স হয়। পরের বছর ময়নাগুড়িতে (জলপাইগুড়ি) ইয়ং বেঙ্গলের হয়ে একটি টুর্নামেন্ট খেলার সময় কলকাতার প্রথম ডিভিসন দল বাটার রক্ষণভাগকে নাজেহাল করে একটি গোল করে এবং বাটা স্পোর্টস ক্লাবের সম্পাদক সুধীর চক্রবর্তীর নজরে পড়ে। '৭৮-এ বাটার ফরোয়ার্ড লাইনে নিয়মিত খেলেছে। এছাড়া আগরতলায় জাতীয় জুনিয়র ফুটবলেও হাজির ছিল বাংলার জার্সি



রঞ্জন ঘোষ

গায়ে। এবছর টালিগঞ্জ অগ্রগামীর কর্মকর্তা স্বপনবাবুর কথায় রঞ্জন টালিগঞ্জ দলে যোগ দিয়েছে।

উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের ছিপছিপে চেহারার রঞ্জনের বাড়ির আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। বাবা অতুলচন্দ্র ঘোষ আগে ছোটখাট ব্যবসা করতেন। কিন্তু বয়স হওয়ায় পরিশ্রমের ধকল সহ্য করতে না পেরে বাড়িতেই থাকেন। ফলে বাড়ি ভাড়া থেকে পাওয়া সামান্য টাকায় সংসার চালাতে হিমসিম অবস্থা। সুতরাং গতবছর স্কুল-ফাইনাল পাস করার পর পড়াশোনা শিকেয় তুলে রঞ্জন ফুটবলের দিকেই পুরোপুরি ঝুঁকে পড়েছে। উৎসাহও পাচ্ছে বাড়ির সকলের ও বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে। এছাড়া অ্যাভিন্যু সম্মিলনীর প্রাক্তন কর্মকর্তা নান্টু মজুমদারের কাছে রঞ্জন দারুণ কৃতজ্ঞ। তিনি এখনও রঞ্জনকে সবরকম সাহায্য করেন। অবশ্য এবছর টালিগঞ্জ কর্মকর্তা গৌতম রায়চৌধুরীর কাছ থেকেও সাহায্য পাচ্ছে। হাসিখুশি ও খোলামেলা রঞ্জন এখন মন দিয়ে কোচ শংকর ব্যানার্জির কাছে নিজের ত্রুটিগুলি শুধরে নিচ্ছে সুরজিত সেনগুপ্তর মত বড় ফুটবলার হবার চিন্তা মাথায় রেখে। এই মুহূর্তে একটা চাকরি ওর বড় দরকার।

★

এবছর ঘরে বাইরের ডাকসাইটে খেলোয়াড়দের নিয়ে গড়া ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে টালিগঞ্জ অগ্রগামীর ১১ জন লড়াকু যোদ্ধার ভূমিকা ফুটবল বোদ্ধাদের দারুণ প্রশংসা কুড়িয়েছে। তবে মাঠে উপস্থিত সকলেরই নজর কেড়ে নিয়েছিল টালিগঞ্জের লেফট ব্যাক অনুদেব দাস। বাংলা তথা ভারতের ডাক-সাইটে রাইট আউট সুরজিত সেনগুপ্তর সমস্ত জারিজুরি এদিন ভোঁতা করে দিয়েছিল এই অখ্যাত তরুণটি। ২১ বছরের অনুদেবের প্রধান অস্ত্র ট্যাকলিং, এছাড়া দারুণ পরিশ্রমী এবং বিপক্ষ খেলোয়াড়কে সব সময় কড়া পাহারা দিয়ে আটকে রাখলেও অনুদেবের গতিটা একটু কম। গতি বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে হেডিংয়ের দিকে একটু নজর দিলে অনুদেব যে কোন ফরোয়ার্ডের মাথা ব্যাথার কারণ ঘটাতে পারবে বলেই কোচ শংকর ব্যানার্জির ধারণা।

টালিগঞ্জ পশ্চিম পুঁটিয়ারির উন্নয়নী সংঘে বড়দের দেখাদেখি বল পেটানো শিখে '৭৩-'৭৪ দু'বছর যথাক্রমে স্যার নৃপেন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউট ও রাজেন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউট এই দুটি স্কুলের হয়ে দক্ষিণ কলকাতা জেলা স্কুল লিগে খেলেছে। খাতা কলমে ফুটবলের বর্ণপরিচয় ও গড়ের মাঠে প্রবেশ '৭৫ সালে রঙ্কু ঘোষের সহায়তায় সাদার্ন সমিতিতে নাম লেখানোর সুবাদে। পরের দু' বছর পাড়ার টুর্নামেন্ট খেললেও ময়দানে খেলেনি নানা কারনে। ওই রকমই একটি টুর্নামেন্টে ওর খেলা দেখে খুশী হয়ে প্রতিবেশী অখিলবাবু (স্পোর্টিং ইউনিয়নের কর্মকর্তা) অনুদেবকে স্পোর্টিং ইউনিয়নে নিয়ে আসেন। সেখানে বিশেষ সুযোগ না পেলেও টালিগঞ্জ অগ্রগামীর হয়ে ভুটানে গোল্ড কাপ ও রাউরকেল্লায় দুটি প্রদর্শনী ম্যাচে ওর লড়িয়ে মেজাজের খেলা ক্লাব কর্তৃপক্ষের মনে দাগ কাটে। ফলস্বরূপ এবছর টালিগঞ্জের লেফট ব্যাকের দায়িত্ব অনুদেবের ওপর ন্যস্ত হয়।

অনুদেবের বাবা শিবপ্রসাদ দাস একটি মার্চেণ্ট ফার্মে সামান্য চাকরি করতেন। তিনি অবসর নেবার পর দশজনের সংসারের খরচ চালাতে স্কুল শিক্ষিকা বড়দির অবস্থা সঙ্গীন। তবুও শত অভাব অভিযোগের মধ্যে দিয়েও অনুদেবের লেখাপড়ায় ভাঁটা পড়তে দেননি। ৭৬ সালে হায়ার সেকেণ্ডারি পাস করার পর অনুদেব এখন শ্যামাপ্রসাদ কলেজের সান্ধ্য বিভাগের বি কম দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। ⚽



অনুদেব দাস

বাংলাদেশ ক্রীড়া লেখকদের চোখে ১৯৭৮-এর সেরা খেলোয়াড়

ঢাকা থেকে আব্দুল তৌহিদ : অপরাপর বছরের মত এবছরও বাংলাদেশ ক্রীড়া লেখক সমিতি সারা দেশ জুড়ে তাদের সদস্যদের মধ্যে সেরা খেলোয়াড় নির্বাচনী জরিপ শেষ করেছে সম্প্রতি। দেশে ও বিদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ক্রীড়াকাণ্ডে আমাদের খেলোয়াড়রা কে কতখানি সফলতা লাভ করেছেন—কোন খেলোয়াড় নিজ কৃতিত্বে, ক্রীড়া কৌশল প্রদর্শনে, মাঠে ও মাঠের বাইরের আচরণে সমিতির সদস্যদের চোখে বিশিষ্ট হয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছেন, এ জরিপ তারই একটা নিরিখ। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা খেলাধূলায় আরও কৃতিত্ব দেখাক, আরও সফল হোক এটা যেমন 'সব খেলা ভালবাসে এমন মানুষরা' চায়, তেমনি আমাদের খেলোয়াড়রা খেলাধূলায় কৃতিত্বের সাথে সাথে ব্যক্তিগত জীবনে ভদ্র, বিনীত ও খেলোয়াড়ী আচার আচরণে একটা নিখুঁত সামাজিক মানুষ হয়ে আগামী দিনের খেলোয়াড়দের কাছে আদর্শ হয়ে উঠুক—বাংলাদেশ ক্রীড়া লেখক সমিতি সেটা মনে প্রাণে চায় খেলোয়াড়দের কাছে।

এই আঙ্গিকে বাংলাদেশ ক্রীড়া লেখক সমিতি বাংলাদেশের অন্যতম সেরা দৌড়বিদ, অত্যন্ত সম্মানিতা, সফল স্পোর্টস মহিলা সুফিয়া খাতুনকে তার ক্রীড়া ক্ষেত্রে অনন্য সাধারণ ভূমিকা, খেলাধূলায় নিষ্ঠা, ব্যবহারিক জীবনে খেলোয়াড়চিত ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ তাকে ১৯৭৮-এর 'শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদ' ঘোষণা করেছে। বাংলাদেশ ক্রীড়া লেখক সমিতি অপরাপর খেলায় যাদের ১৯৭৮-এর সেরা নির্বাচিত করেছে তারা হলেন :

ফুটবলে : শহীদুর রহমান সান্টু (মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব)

হকিতে : ডন ডন লুসাই (পুলিশ এ সি)

ক্রিকেটে : শফিকুল হক হীরা (আজাদ বয়েজ ক্লাব)

ভলিবলে : ইকবাল হোসেন (ওয়াপদা)

বাস্কেটবলে : কবীর আহমেদ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং)

অ্যাথলেটিক্স (পুরুষ) : মোঃ মাইনুদ্দিন (বস্ত্রকল সংস্থা)

অ্যাথলেটিক্স (মহিলা) : মেরিনা খান (বস্ত্রকল সংস্থা)

ব্যাডমিণ্টন : মনোয়ারুল আলম বাবল (মেট্রোপলিটন ব্যাডমিণ্টন ক্লাব)

কবাডি : নুরুল ইসলাম (বি ডি আর)

বাংলাদেশ ক্রীড়া লেখক সমিতি সেরা ক্রীড়া সংগঠক হিসাবে নির্বাচিত করেছে মরহুম জনাব আবুল হাসনাতকে। জনাব হাসনাত একমাত্র ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব যিনি নীরবে ক্রীড়া বিষয়ক সাংগঠনিক কাজে বাংলাদেশের তাবদ ক্রীড়া সংগঠকদের আদর্শ ছিলেন। জনাব হাসনাতকে যখন সেরা ক্রীড়া সংগঠকরূপে মনোনয়ন দেওয়া হয় তখন তিনি বাংলাদেশ কবাডি ফেডারেশনের প্রধান হিসাবে কাজ করছিলেন। এশীয় কবাডি ফেডারেশন গঠনে তার ভূমিকার স্বীকৃতি স্বরূপ তাকে সে ফেডারেশনের সহ-সভাপতি করা হয়েছিল।

চতুর্থ জাতীয় সাইক্লিং

এ বছরে চতুর্থ জাতীয় সাইক্লিং প্রতিযোগিতার আসর বসেছিল কুমিল্লায়। ব্যবস্থাপনায় যৌথভাবে ছিল বাংলাদেশ সাইক্লিং ফেডারেশন আর কুমিল্লা জেলা ক্রীড়া সংস্থা। ৮ জুন থেকে ১০ জুন তিন দিনের ছিল এই প্রতিযোগিতা। মোট বিষয় ছিল ৮টা। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগবশত সবগুলো বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি এবারে। ৮টি বিষয়ের জায়গায় মোট ৫টি বিষয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল কুমিল্লার অভয় আশ্রমের কাছে পুরোন এয়ারপোর্ট রোডে। মোট ৫টি সংস্থার ৫টি সাইক্লিস্ট দল এবারের জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল। এক বর্ণাঢ্য পরিবেশে কুমিল্লার ডেপুটি কমিশনার এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। আর প্রতিযোগিতার শেষ দিনে সমাপ্তি উৎসবে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের সভাপতি বিগ্রেডিয়ার এম এস ধারী। তিনিই বিজয়ী সাইক্লিস্টদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।

যে সমস্ত সংস্থা এবারের জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল সেগুলো হলো : চট্টগ্রাম বিভাগ, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা মেট্রোপলিশ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ কলকারখানা সমূহের সম্মিলিত দল আর বাংলাদেশ মুক্তি যোদ্ধা সংসদ।

এবারের প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে সবচেয়ে সফল সাইক্লিস্ট হলেন ঢাকা মেট্রোপলিশ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিযোগী শহীদুল হক শিকদার। তিনি দুটো সর্ট ডিসটান্স বিষয়ে বিজয়ী হয়ে দুটো সোনা জিতেছেন। আর সাড়ে বাষট্টি মাইল রোড রেসে সোনা জিতেছেন বাংলাদেশ চটকল সংস্থার মতিউর রহমান। মতিউর রহমান এ দূরত্ব পাড়ি দিতে সময় নিয়েছিলেন ৩ ঘণ্টা ২৫ মিনিট ২০.৫ সেকেণ্ড। এ বিষয়ে নতুন রেকর্ডও করেছেন। পূর্ববর্তী রেকর্ড ছিল ৩ ঘণ্টা ৫৪ মিনিট ৩৩ সেকেণ্ড।

মহিলাদের বিভাগে সবচেয়ে কৃতী সাইক্লিস্ট হলেন মিস জোবেরা রহমান লিনু। পাটকল সংস্থার এই বালিকা সাইক্লিস্ট ১০০০ মিটার ও ২০০০ মিটার স্ক্র্যাচ রেসে প্রথম হয়ে দুটো সোনা জিতেছে।

জাতীয় সাইক্লিং-এর বিশদ ফলাফল হলো পুরুষ বিভাগ :

১০০০ মিটার টাইম ট্রায়াল—১ম শহীদুল হক শিকদার, ২য়—সেখ আলিম বক্স ও ৩য়—যুগ্মভাবে শাহেদ বাবুল ও সেলিম বক্স।

১০০০ মিটার স্প্রিণ্ট রেস—১ম শহীদুল হক শিকদার, ২য়—মোঃ সোহরাবউদ্দিন ও ৩য়—শাহেদ বাবুল।

১০০ কিলোমিটার (৬২-১/২ মাইল) রোড রেস—১ম—মতিউর রহমান, ২য়—মোঃ আজাহার, ৩য়—আলিম বক্স।

মহিলা বিভাগ :

১০০০ মিটার স্ক্যাচ রেস—১ম জোবেরা রহমান লিনু, ২য়—সেলিনা সুলতানা ও ৩য়—সুফিয়া বেগম।

২০০০ মিটার স্ক্যাচ রেস—জোবেরা রহমান লিনু, ২য়—সুফিয়া বেগম ও ৩য়—সেলিনা সুলতানা।



সুফিয়া খাতুন—১৯৭৮-এর শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় / খন্দকার তারেক

দমে কি মেয়েরা ছেলেদের সমকক্ষ হতে চলেছে ?

সুজিত সিংহ ঃ মেয়ে খেলোয়াড়রা দুর্বল স্ত্রী-জাতি হিসাবে পরিগণিত হয়ে আসছে— তা আর বেশী দিন চলবে মনে হয় না। তারা এখন অনেকটা স্কুলের সেকেণ্ড বয়ের মত। ক্লাসের প্রথম ও দ্বিতীয় ছাত্রের মধ্যে যে একটা তারতম্য থাকে তা খুবই কাছাকাছি। তাই দুর্বল বা অবলা স্ত্রী-জাতি নামটা অচিরেই মুছে যাবে।

মেয়েদের খেলার জগতে আগমন পুরুষদের তুলনায় খুবই অল্প দিনের। প্রাচীন ওলিম্পিকে মেয়েদের যোগদান তো দূরের কথা— দর্শক হিসাবে আসারও কোন অধিকার ছিল না। এথেন্সে এক ভদ্রমহিলা তার ছেলেকে উৎসাহ দেবার জন্য ছদ্মবেশে দর্শক হয়ে আসেন এবং ছেলের সাফল্যের আনন্দে চিৎকার করে ওঠার সময় তিনি ধরা পড়েন। ফলে ফাঁসির উপক্রম হয়।

আধুনিক ওলিম্পিকের শুরু ১৮৯৬ সালে। তখনও মেয়েদের প্রবেশাধিকার ছিল না। মেয়েদের প্রবেশাধিকার অর্থাৎ যোগদান আরম্ভ হয় অনেক পরে। এখন দেখা যাচ্ছে দলে দলে মেয়েরা (যে সব দেশে পুরুষ ও মেয়েদের সমান অধিকার আছে) খেলার জগতে প্রবেশ করে এবং বিভিন্ন খেলাধুলায় পারদর্শিতাও দেখাচ্ছে।

অ্যাথলেটিক্স-এ (ট্র্যাক অ্যাণ্ড ফিল্ড) পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের কেমন অগ্রগতি হয়েছে, তার বিশদ বিবরণ এখানে দিচ্ছি। এখনও সকলের ধারণা মেয়েদের এই খেলার জগতে আগমন নিছক সাইকোলজিক্যাল গ্লামার। কিন্তু যদি ভাল করে অনুসন্ধান করা যায় তবে দেখা যায় যে, বিভিন্ন বিষয়ের খেলার মধ্যে এই অ্যাথলেটিক্স-এর ট্র্যাক অ্যাণ্ড ফিল্ড বিভাগটি মেয়েদের মধ্যে বেশ ভালভাবে ঢুকে পড়েছে। এবং মেয়েরা তাদের মান খুব তাড়াতাড়ি উঁচুতে এনেছে। ভালভাবে খতিয়ে দেখলে এ প্রমাণ করা অসম্ভব হবে না যে মেয়েরা খুব দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে পুরুষদের তুলনায়।

মেয়েরা দমের ক্ষেত্রে ট্র্যাক অ্যাণ্ড ফিল্ড-এ ছেলেদের প্রায় ধরে ফেলেছে। ভবিষ্যতে দমের ক্ষেত্রে মেয়েরা ছেলেদের হারিয়ে যদি এগিয়ে যায় তবে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সাধারণত মাঝারি পাল্লা ও দূর পাল্লা দৌড়গুলোকে আনস্কিল্ড বিষয় বলে মনে করা হয়।



জ্যামেন আলবুকার্ক/হোসি মিশ্র



গীতা জুৎসি/অমিয় তরফদার

দেহগত দিক থেকে মেয়েদের ছেলেদের থেকে অনেক এনাটমি এবং ফিজিয়লজিক্যাল তারতম্য আছে এবং অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন, মেয়েরা কঠিন কোন দমের কাজ অর্থাৎ ৪০০ মিঃ, ৮০০ মিঃ ও ১৫০০ মিঃ বা ম্যারাথন প্রভৃতিতে অংশ গ্রহণ করে খুব ভাল ফল দেখাতে পারবে না। কারণ—তাদের দেহগত গঠন (ভিতর ও বাইরের) ছেলেদের থেকে কিছু তফাৎ আছে। সেই জন্য অনেকের ধারণা, মেয়েদের বেশী দমের বা খাটুনির কাজ করা উচিত নয়। অস্ট্রেলিয়ার Dr Jarina Gaisolova এবং জার্মানির Dr. Mellerovicy- র ধারণা, দমের কাজ ছেলেদের থেকে ৩০—৪০% কম করা উচিত মেয়েদের।

আবার অনেকের ধারণা অনুশীলনের অনুষ্ঠান-সূচী পুরুষদের সমান হওয়া উচিত। যেমন ওরা বলেন, একই বয়সের দুজন শিক্ষা প্রাপ্ত নয় এমন ছেলে ও মেয়েদের এখানে ছাড় আছে। চার্ট দেখুন, কার্যক্ষমতা একটু কম হবে। এখন মেয়েদের সম্পর্কে যারা ভাবছেন, তারা বলেন—যদি মেয়েদের কার্যক্ষমতা একটু একটু করে বাড়নো যায় তবে তাদের হৃদযন্ত্রের ভাইটাল ক্যাপাসিটিও বাড়তে থাকে। সোমাটো টাইপ অ্যানালেসিস করে দেখা গেছে মাঝারি পাল্লা ও দূর পাল্লার ছেলে-মেয়েদের ওজন ও উচ্চতাও অন্যান্য মাপ চোখের তারতম্য অল্পই হয়। মেয়েদের শরীরে Fat Muscles বেশী থাকার জন্য তার ক্রস সেকশন-এর আয়তন কম। সেজন্য ছেলেদের থেকে মেয়েদের শক্তি কম হয়। Androgen নামে একটা হরমন যা ছেলেদের মধ্যে বেশী থাকায় ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে বেশী শক্তির কাজ করতে পারে। যদি সমবয়সী কোন ছেলে ও মেয়েকে এক ধরনের দম বাড়াবার জন্য যে সকল অনুশীলন আছে তা দেওয়া যায় তবে প্রথমে দেখা যায় মেয়েদের ক্ষমতা ছেলেদের থেকে ২০% কম। আবার যদি এই সব মেয়েদের ইন্টারভাল ট্রেনিং করানো যায় তা হলে দেখা যাবে তাদের দৌড়ের তীব্রতা কম হয় ও হার্টরেট ১৫০—১৬০ হয় কিন্তু ১৭০—১৮০ হওয়া উচিত। আবার কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর দেখা যায় তাদের হার্টরেট ১০০—১১০ এ নেমে গেছে। যেখানে হওয়া উচিত ছিল ১২০—১৩০। এর থেকে বোঝা যায় তাদের হার্টের ক্ষমতা ও আয়তন বাড়েনি ও ইন্টারভাল ট্রেনিং-এর উপযুক্ত হয়নি। দম বাড়াবার জন্য Work load-এর যে বিভিন্ন ছক আছে তাতে অ্যারোবিক পদ্ধতিতে কাজের উপর মেয়েদের বেশী জোর দেওয়া হয়। একটা আন্তর্জাতিক সেমিনার Ergometry ১৯৬৭ সালে হয়, তাতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল ৮০০—১০,০০০ এবং ম্যারাথন দৌড়ে কি রকম Aerobic এবং Anaerobic-এর তারতম্য হয়।

Aerobic সাধারণত এক কথায় অক্সিজেন গ্রহণ করার ক্ষমতা বাড়ায়। এটাই মাঝারি পাল্লা ও দূর পাল্লা দৌড়বিদের প্রাথমিক প্রয়োজন। Aerobic প্রথায় দম বাড়ানোকে বলে হার্ট এণ্ডুরেন্স। তাতে শরীরের মধ্যে অক্সিজেন-এর অভাব হয় না। রক্ত চলাচলও ভালভাবে হয়। এবং প্রকৃত দমের বা অক্সিজেনের অভাব কম হয়। তার মানে কার্যক্ষমতা বাড়ে। হার্টের স্ট্রোক ভলুম বাড়ে না, পালস বিটিং-এর রেটও বাড়ে না। তাতে দেখা যাচ্ছে বেয়রশুমেও অনবরত ৪০—৮০ মিনিট দৌড়ে আস্তে আস্তে হার্টে ভলুম ও ক্যাপাসিটি বাড়ে। অক্সিজেন গ্রহণ করার ক্ষমতাও বাড়ে। [Promote alveolar hyperplasia—nyper trophy of diaphragm]

বেমরশুমে ক্রসকাণ্ট্রি বা Tempo run, tender pace ১—১-১/২ ঘণ্টা যদি করানো যায় তবে প্রথমে heart beating ১৫০—১৯০ থাকে। তারপর দেখা যায় কিছু সময় বাদে ১৬০—১৭৫ চলে আসে। দূর পাল্লার রিপিটেশন যদি করানো যায় তবে হার্ট বিটিং ১৭০—১৯০-এ ৫—১০ মিনিট বিশ্রাম থাকে দুটো রিপিটেশনের মধ্যে। এই তিন নিয়মের উপর যে দম, হার্টের ক্যাপাসিটি aerobic প্রথায় বাড়ানো হচ্ছে, তাতে মেয়েদের দেখা যাচ্ছে ছেলেদের থেকে কার্যক্ষমতা বিশেষ কিছু পার্থক্য থাকে না। মেয়েরা প্রায় দমের ব্যাপারে ছেলেদের ধরে ফেলেছে।

একজন জার্মান অধ্যাপক স্পোর্টস মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, Wildor Hoffmall বলেছিলেন, মেয়েদের প্রচুর দম আছে। তার মানে এখানে বলা হচ্ছে যে অদূর ভবিষ্যতে মেয়েরা দমে ছেলেদের সমকক্ষ হবে। হয়তো তারা ছেলেদের চাইতে বেশী দম রাখতে সক্ষম হবে। যেমন—দূর পাল্লা সাঁতারে, স্কি, স্কাই ডাইভিং, স্পেস জারনি, রোয়িং, সাইক্লিং প্রভৃতি বিষয়ে। Aerobic প্রথায় মেয়েদের হার্টের কর্মক্ষমতা বাড়ানো হচ্ছে, এটার কার্যকারিতা নির্ভর করে মেয়েদের শারীরিক আকৃতির উপর। তাছাড়া আয়তন ছোট থাকায় এনার্জি অনেক বাঁচে।

সাধারণত মেয়েদের আয়রন স্টোরিং ক্ষমতা কম। কিন্তু মেয়েদের শরীরে আয়রন বেশী যাওয়া উচিৎ। এমনি দেখা গেছে মেয়েদের শরীরে আয়রন কম। আমরা জানি, আয়রন না থাকলে ব্লাড হোমগ্লোবিন তৈরি হয় না। ব্লাড হোমগ্লোবিন সমস্ত শরীরে অক্সিজেন চালনায় সাহায্য করে। এর অভাবে পেশী সংকোচন প্রয়োজন মতো হয় না। যার ফলে তাড়াতাড়ি দম নষ্ট হয়ে যায় এবং সহজেই ক্লান্তি আসে। ক্যালসিয়াম, ভিটামিন এবং Thiamine Pyridoxine যুক্ত খাবার খেতে হবে। এরা Lactic acid formation করে দৌড়বার সময়। ওই খাদ্য তা নষ্ট করে দেয় এবং এনার্জি বাড়িয়ে দেয়।

ক্যালসিয়াম হৃদযন্ত্রের কার্য ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে মেয়েদের মধ্যে কিছু হর্মোন আছে যা প্রধানত তাদের দম বাড়াতে সাহায্য করে। Prof. Hoffmall বলেছেন, সাধারণত Testosterone নামে একটা Sex হর্মোন যা ছেলেদের পেশীর ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। ওই বিষয়ে মেয়েরা কখনই সাধারণভাবে ছেলেদের সমকক্ষ হতে পারবে না। ঠিক মেয়েদের ঋতুর সময়-এর আগে তাদের হৃদযন্ত্র এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের কর্মক্ষমতা অনেক বেড়ে যায়।

ওই জন্য দেখা যায় যে বয়সী মেয়ে খেলোয়াড়ের পুরুষদের থেকে কম হার্ট অ্যাটাক হয়। সাধারণত মেয়েদের Sex Hormone যার নাম 'Oestrogen' এর কাজ Thrombosis কে প্রথম অবস্থায় নষ্ট করে দেয়, তার স্থানে পুরুষদের Testosterone রক্ত কণিকা জমাতে সাহায্য করে। অনেকদিন গবেষণার পর মার্কিন দেশের বৈজ্ঞানিক ডাক্তাররা এখন ভাবছেন, ওষুধের সাহায্যে কেমন করে ওই Testosterone হৃদযন্ত্রের Thrombosis হবার সাহায্য করে।

গত বিশ বছরের মধ্যে ছেলে মেয়েরা প্রভূত উন্নত অ্যাথলেটিক্সের বিভিন্ন বিষয়ে। আগে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে যে একটা বিরাট ফারাক ছিল, তা ক্রমশ কমে আসছে। মাঝারি পাল্লা ও দূর পাল্লা দৌড়গুলোতে ছেলেদের থেকে মেয়েরা বেশী সময় কমাতে পেরেছে এবং ছেলেদের থেকে মেয়েরা পিছিয়ে আছে কেবল ১০% এর ব্যবধানে। যেমন ৮০০ মিটারে সময় সবচেয়ে কমিয়েছে উভয়েই—ছেলে ও মেয়েরা। ওই কমানোর ব্যাপারে ছেলেরা, মেয়েদের থেকে পিছিয়ে পড়েছে। যেমন—মেয়েরা উন্নত করেছে ৮·১৮%, সেখানে ছেলেরা কমিয়েছে ২·৭০%।

১৯৭২ সালের ওলিম্পিকের সময় ধরে যদি মেয়েদের এবং ছেলেদের বিচার করা যায় তাহলে দেখা যাবে মেয়েদের একই গতিতে দৌড়বার ক্ষমতা ছেলেদের থেকে একটু বেশী। ৪০০ মিটার যে গতিতে মেয়েরা দৌড়োয় তার দ্বিগুন করলে যা হয় তার সময় নির্ধারিত সময় থেকে ১৬.৫৩% কম থাকে। কিন্তু ছেলেদের বেলায় সেটা হয় ১৭.০৪%। ৪০০ মিটারে মেয়েদের ও ছেলেদের সময় কমানোর শতকরা হিসাব যদি করা যায় তবে দেখা যাবে ১১.৫৩% তফাৎ। ছেলেরা ৯.৫৮%। কিন্তু মেয়েরা ৫.৪৭% সময়ের উন্নতি করেছে গত ১৮ বছরে। ১৯৭২ সালে ১৫০০ মিটার ওলিম্পিকে যুক্ত হয় এবং এখানেও প্রমাণ করা যাচ্ছে মেয়েরা প্রায় ছেলেদের কাছাকাছি এসে গেছে। তারা কেবল ১০% পিছিয়ে আছে। ম্যারাথন দৌড়ে দেখা গেছে মেয়েরা ২০% এর কিছু বেশী সময়ে পিছিয়ে আছে। কিন্তু মেয়েরা সবে এটা অনুশীলন করছে। আমার ধারণা এই বিভাগেও ওরা খুব শীঘ্রই ছেলেদের সঙ্গে ১০% ব্যবধানের মধ্যে চলে আসতে সক্ষম হবে। যদিও এটা ওলিম্পিকের বিষয়ের মধ্যে নেই।

পুরুষ—D Clayton—সময় লাগে ম্যারাথন দৌড়তে ২ ঘণ্টা ০৮.৩৩ মিঃ, সেখানে মেয়েদের মধ্যে, C Langlaee-এর সময় লাগে ২ ঘণ্টা ৩৫.১৫ মিনিট। এদের মধ্যে তফাত ২০.৭৭%।

টেবিল দেওয়া হল ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৭৮ ওলিম্পিকে ৪০০ থেকে ১৫০০ মিঃ ছেলে ও মেয়েদের কত সময় লেগেছে এবং তার পার্থক্য কতখানি।

		৪০০ মিঃ	৮০০ মিঃ	১৫০০ মিঃ	গড় পার্থক্য
১৯৬০	পুরুষ—	৪৮.৯ সেঃ	১ : ৪৬.৩	৩ : ৩৫.৬	১৬.৯৩%
	স্ত্রী —	--	২ : ০৪.৩	—	
	পার্থক্য—	—	১৬.৯৩	—	
১৯৬৪	পুরুষ—	৪৫.১	১ : ৪৫.১	৩ : ৩৮.১	১৫.২৬%
	স্ত্রী —	৫২.০	২ : ০১.০	—	
	পার্থক্য—	১৫.৩	১৫.২২	—	
১৯৬৮	পুরুষ—	৪৩.৮	১ : ৩৪.৩	৩ : ৩৪.৯	১৭.৩১%
	স্ত্রী —	৫২.০	২ : ০০.৯	—	
	পার্থক্য—	১৮.৭২	১৫.৯১		
১৯৭২	পুরুষ—	৪৪.৬	১ : ৪৫.৯	৩ : ৩৬.৩	
	স্ত্রী —	৫১.০	১ : ৫৮.৬	৪ : ০১.৪	১২.৯৭%
	পার্থক্য—	১৪.৩৫	১১.৯৯	১১.৬০	
১৯৭৬	পুরুষ—	৪৪.২	১ : ৪৩.৫	৩ : ৩৯.১	
	স্ত্রী —	৪০.৩	১ : ৫৪.৯	৪ : ০৫.৪	১১.২৯%
	পার্থক্য—	১১.৫০	১০.৩৬	১২.০০	

পশ্চিম জার্মানির অধ্যাপক Hoffmall পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জোর গলায় বলেছেন, মেয়েরা পুরুষদের তুলনায় হৃদযন্ত্র এবং ফুসফুসের কর্মদক্ষতা, শরীরে রক্ত চলাচলে এগিয়ে।

অক্সিজেনের ঠিকভাবে প্রবাহ এবং মাংসপেশীর ফিজিক্যাল ও কেমিক্যাল-এর যে ভাঙাগড়া চলে দৌড়বার সময় সেটা খুবই সঠিকভাবে হয়ে থাকে। Aerobic প্রথায় দম বাড়াবার জন্য মেয়েদের অক্সিজেন ধরে রাখবার ক্ষমতা পুরুষদের থেকে কম নয়, শুধু যা একটু সময় বেশী লাগে। আর অনুশীলনের ব্যাপারে মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় বেশী নিয়মানুবর্তী। পুরুষদের বেশী অক্সিজেন-এর প্রয়োজন হয়। কারণ তাদের মাংসপেশী খুবই মোটা ও শক্ত মেয়েদের তুলনায়।

পশ্চিমবঙ্গের নামী নামী ফুটবলার ও হকি খেলোয়াড়দের পরীক্ষা করে দেখেছি তারা এদেশের ১৪/১৫ বছরের অ্যাথলেটিক মেয়েদের কাছে ২।৩ কিঃ মিঃ Tempo দৌড়ে অথবা Cross Country (ক্রস কাণ্ট্রি) দৌড়ে পাল্লা দিতে পারে না।

ক্লাব থেকেই স্বীকৃতি পেলাম না : শৈলজা রঞ্জন রায়

সমীর ঘোষ : ভাবতে পারেনি যার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি তিনিই দরজা খুলে সামনে দাঁড়াবেন। কার্তিক বসুর মুখে শুনেছিলাম অধ্যাপক শৈলজা রঞ্জন রায়ের কথা। সম্পর্কে কার্তিকবাবুর মামাতো ভাই। কার্তিকবাবু আরও বলেছিলেন, অধ্যাপক রায় সম্ভবত একমাত্র জীবিত সমসাময়িক খেলোয়াড় যিনি গোষ্ঠ পালের সঙ্গে খেলেছেন। এখন যিনি পঁচাশির ঘর পার করে ছিয়াশির ঘরে হাঁটছেন। তাই আমার ভাবনা ছিল তাকে গিয়ে কি অবস্থায় পাবো। বয়স হয়েছে, অতএব স্মৃতির মণিকোঠা ঘেঁটে তিনি আমাকে তার ফেলে আসা মাঠের দিনগুলির কথা বলতে পারবেন তো? আমার সব ধারণাই একে একে মিথ্যে হয়ে গেছে। এখনও বেশ শক্ত সমর্থ আছেন এবং অল্প আয়াসেই স্মৃতির ডালিটুকু উজাড় করে দিয়েছিলেন আমার সামনে।

সে এক সময়ের কথা যখন স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্রিকেট দল অনায়াসেই গঠন করা হত রায় পরিবার ও বসু পরিবার মিলিয়ে। কতই বা তখন তাদের বয়স! ফুটফুটে ছেলেদের ভিড় দেখে মনে হত একটি দল নয়, যেন মাঠে পাতা এক সংসার। অধ্যাপক রায়ের বাবা মুক্তিদা রঞ্জন রায়ের নামও ক্রীড়া রসিক মহলে একদিন যথেষ্ট আদর পেয়েছে। দুই সহোদর হৈমজা রায় ও খৈমজা রায় নাম করেছিলেন। যেমন সবাইয়ের ক্ষেত্রে ঘটে তেমনি শৈলজা রায়ের ক্ষেত্রেও ঘটেছে। সাত আট বছর থেকেই সব খেলা কিছু না কিছু খেলেছেন।

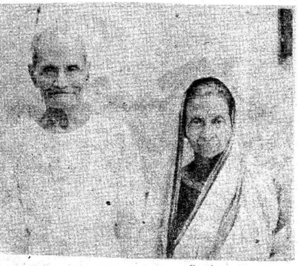
১৯০৬ সালের কথা, মাত্র ১৩ বছর বয়সে স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাবে ক্রিকেটের পূর্ণতা লাভের পাঠ নিতে শুরু করেন। তখনকার স্পোর্টিং ইউনিয়নের দুটি দল ছিল। দ্বিতীয়টিতে স্থান লাভ করেছিলেন। তবে বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি। মাত্র তিন বছর পরেই বড়দের সঙ্গে মাঠে নেমে পড়েছিলেন। মাঝে মাঝে হাত ঘোরালেও ব্যাট হাতে বেশি সফল হয়েছিলেন। এই সফলতা ধরেও রেখেছিলেন প্রায় বছর ছয়েক। হয়ত ব্যাটসম্যান হিসাবে তার প্রতিষ্ঠার সোপানে ওঠা শুরু হয়েছিল। কিন্তু কোন গ্রহের অশুভ ছায়া তাকে ব্যাটসম্যান হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেতে দিল না।

আজও সেই দিনটির কথা ভেবে শিউরে ওঠেন। চোখের সামনে পরিষ্কার ভেসে ওঠে ৩ ডিসেম্বর ১৯১১ সাল। শৈলজা রায়েরা তখন থাকিতেন সুকিয়া স্ট্রিট অঞ্চলে। স্পোর্টিং ইউনিয়ন বনাম রেঞ্জার্সের খেলা মার্কাস স্কোয়ারে। ইংল্যাণ্ডের ক্রিকেটার কার্টিস হেওয়ার্ড উপস্থিত থাকবেন। মন ছিল প্রফুল্ল। তবে কিছুটা উত্তেজনায় ভুগছিলেন। সাইকেলের প্যাডেলে পা চলছিল দ্রুত গতিতে। ঠনঠনে কালী বাড়ীর সামনে ট্যাক্সির সঙ্গে সংঘর্ষ। দু' পায়ের হাঁটু ভীষণভাবে জখম হল। ডান পায়ের হাঁটু আর আগের মত অবস্থায় কোনদিনই ফিরে এল না। চিরকালের জন্য সেটি তার স্বাভাবিক ক্ষমতা হারাল। এই দুর্ঘটনার আগে হকি ও ফুটবল নিয়মিত খেলতেন। চিরদিনের জন্য ওই দুটি খেলায় অংশ গ্রহণের পথ বন্ধ হয়ে গেল। ছিলেন ব্যাটসম্যান, রূপান্তরিত হলেন বোলারে। হাঁটু মুড়ে বেশীক্ষণ থাকা সম্ভব নয় বলেই এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল।

সে সময়ে যে ধরনের খেলা হত তার অধিকাংশতেই তিনি অংশগ্রহণ করেছেন যোগ্যতার সঙ্গে। ফ্লাইটের সঙ্গে স্পিন মিশিয়ে দেবার এক অদ্ভুত কৌশল রপ্ত করেছিলেন। উল্লেখযোগ্য খেলার মধ্যে ছিল বেঙ্গলি স্কুল বনাম ব্রিটিশ স্কুল। যাদের পড়াশুনার সময়টা কলকাতায় কাটতো তাদের ফেলা হত বেঙ্গলি স্কুল দলে। আর যারা ইংল্যাণ্ডে পড়াশুনা করেছেন তাদের ফেলা হত ব্রিটিশ স্কুল দলে। বেঙ্গলি স্কুল দলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন বহুবার। তার মধ্যে পরপর দশবার অধিনায়ক। এই বেঙ্গলি স্কুল দলে খেলার সূত্রে গোষ্ঠ পালের সান্নিধ্যে এসেছিলেন।

নেশায় ক্রিকেটার হলেও পেশায় ছিলেন পুরো মাত্রায় অধ্যাপক। ১৯১৬ থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত অধ্যাপনা করে গেছেন বিদ্যাসাগর কলেজে। এর মধ্যে একটানা দীর্ঘকাল ছিলেন পদার্থ বিদ্যার প্রধান অধ্যাপক। নিজের উপার্জনে যে বাড়িটি করেছিলেন সেটিই বর্তমানে তার আয়ের উৎস। নিঃসন্তান শৈলজাবাবু ও তার স্ত্রীর দিন গুজরান তাতেই মোটামুটিভাবে চলে যায়।

নিঃস্বার্থভাবে ক্রিকেটের সেবা করে গেছেন। কি পাবেন তা নিয়ে কখনও ভেবে দেখার প্রয়োজন অনুভব করেননি। নির্মল আনন্দ মাঠে টেনে নিয়ে যেত। আজও মাঠ মাঝে মাঝে টানলেও শরীরের উপর বেশী ভরসা রাখতে পারেন না। পশ্চিমবঙ্গ স্পোর্টস কাউন্সিলের পক্ষ থেকে মানপত্র দিয়ে ও সি এ বি-র তরফ থেকে তাম্র পত্র দিয়ে স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাবের জন্য একদিন তিনি ঘাম ঝড়িয়েছিলেন তার কোন স্বীকৃতি আজও পাননি। শুধু তাই নয়, ক্লাবের সুখ দুঃখের দিনে একদিন নিজেকে সাথী করে নিয়েছিলেন। আজ ক্লাব তাদের সুখ দুঃখে তার কথা মোটেই স্মরণ করতে চান না।



সস্ত্রীক শৈলজারঞ্জন রায়

ইস্টার্ন রেল ও ব্যারেট ক্লাব যুগ্মবিজয়ী

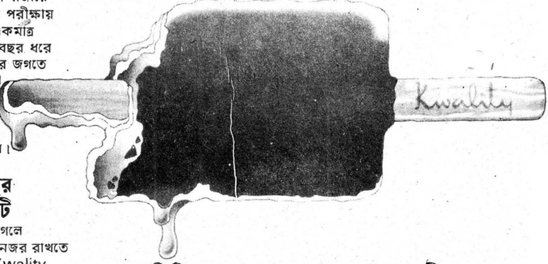
আসানসোলের প্রতিনিধি : সম্প্রতি আসানসোল বুধা মাঠে বুধা চ্যালেঞ্জ ফুটবল প্রতিযোগিতায় ইস্টার্ন রেল (হাওড়া) ও স্থানীয় ব্যারেট ক্লাবের মধ্যে ফাইনাল খেলাটি তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। প্রথমার্ধের পনেরো মিনিটে ব্যারেট ক্লাবের প্রেমদাস মুখার্জি গোল করে দলকে এগিয়ে দেয়। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই হাওড়ার হিরন্ময় মিশ্র ব্যারেট ক্লাবের দুই স্টপারের ভুল বোঝাবুঝির সুযোগ নিয়ে গোলটি পরিশোধ করে। দুই দলই এরপর গোল করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে কিন্তু প্রতিপক্ষের রক্ষণভাগের দৃঢ়তার জন্য কোনপক্ষই গোল করতে পারে না।

নির্ধারিত সময়ে মীমাংসা না হওয়ায় অতিরিক্ত সময় খেলা হয় কিন্তু কোন গোল না হওয়ায় উভয় দলকে যুগ্মবিজয়ী ঘোষণা করা হয়।

প্রতিযোগিতার শেষে প্রধান অতিথি শৈলেন মান্না খেলোয়াড়দের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। ব্যারেট ক্লাবের রাইট ব্যাক অরুণ রায় এবং বুধা ফুটবল ক্লাবের সঞ্জয় সরকার যথাক্রমে সিনিয়র ও জুনিয়র শ্রেষ্ঠ ফুটবলারের সম্মানে ভূষিত হয়। এবারের প্রতিযোগিতায় আসানসোল, বার্নপুর, দুর্গাপুর, বর্ধমান, চন্দননগর, হাওড়া, বহরমপুর, জামসেদপুর এবং ধানবাদ থেকে চল্লিশটি দল অংশগ্রহণ করেছিল।

"আইসক্রীম বলতে কোয়ালিটি"

দেখা যাক আপনিও একমত কিনা



১ এগিয়ে থাকার কোয়ালিটি

কত ব্র্যাণ্ড তো বাজারে এলো গেলো। সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে কিন্তু একমাত্র Kwality এবং ৩৫ বছর ধরে এর নাম আইসক্রীমের জগতে প্রথম সারিতে রয়েছে। এখন কলকাতায় দশটি আইসক্রীমের মধ্যে কম-সে-কম সাতটি'ই Kwality-র।

২ উপাদানের কোয়ালিটি

অগ্রণী হতে গেলে অনেক কিছুর উপর নজর রাখতে হয়। এই কারণেই Kwality আইসক্রীম তৈরী হয় সেরা উপাদান দিয়ে। এতে আছে দুধ, মাখন, চিনি, ফল, বাদাম এইসব। মেশানো থেকে প্যাকেটে ভরা পর্যন্ত সবটাই হয় অটোমেটিক মেশিনে, তাই কোথাও হাতের ছোঁওয়াটুকু পর্যন্ত লাগেনা। Kwality আইসক্রীম সম্পূর্ণভাবে পাস্তুরাইজড অর্থাৎ বীজাণুমুক্ত। সবসময়ে টাটকা ও মজাদার। প্রতি চামচেই ঘন মোলায়েম ক্রীম...জিভে ঠেকালেই—আহা কী দারুণ স্বাদ!

এছাড়া প্রত্যেকটি ব্যাচ যাচাই করে দেখা হয় যতটা পরিমাণে থাকার কথা ঠিকঠিক আছে কিনা ... আর খাদ্যগুণ ঠিক আছে কিনা।

৩ বিভিন্ন স্বাদের কোয়ালিটি

কোন্ বা স্টিক্, কাপ্ বা ব্রিক্ যাই হোক না কেন, Kwality মানেই উৎকৃষ্ট কোয়ালিটি। খেতে মজা, গুণে রাজা–Kwality। ভ্যানিলা, স্ট্রবেরি, চকোলেট...কেসর পেস্তা, কাসাটা, কেসর পেস্তা মালাই ...চক্-ও-নাট্ এবং টু-ইন্-ওয়ান্ ...টোস্টেড আমণ্ড্—এমনি আরো কত দারুণ স্বাদের মজা!

৪ আরেকটি গুণ—সহজে পাওয়ার কোয়ালিটি

সবাই পছন্দ করেন Kwality। তাই আমাদের দায়িত্ব সবার কাছে Kwality পৌঁছে দেওয়া। নীল-সাদা-ডোরা আঁকা Kwality আইসক্রীমের গাড়ি হরদম রাস্তায় টহল দিচ্ছে। তাছাড়া নানান হোটেল, রেস্তোরাঁ, সিনেমা, দোকান, চিড়িয়াখানায় Kwality-র প্রায় শ-তিনেক খুচরো বিক্রির ব্যবস্থা আছে। এছাড়াও সারা দেশে ছড়ানো আছে Kwality রেস্তোরাঁ। অর্থাৎ আপনি যেখানেই যান, সেখানেই পাবেন Kwality-র কোয়ালিটি।

আইসক্রীম বলতে কোয়ালিটি

Kwality

কোয়ালিটি আইসক্রীমস প্রাইভেট লিমিটেড ৭৪ ডায়মণ্ড হারবর রোড কলিকাতা ৭০০০২৩



সস্ত্রীক সুনীল পাণ্ডা

অদ্বিতীয় সুনীল পাণ্ডা

বিনু চ্যাটার্জি : বম্বের মাতোঙ্গা জিমখানা বাস্কেটবল কোর্টে সর্বভারতীয় আঞ্চলিক বাস্কেটবল প্রতিযোগিতার খেলা চলছে। বাংলা-রাজস্থানের খেলা তখন প্রায় দশ মিনিট হয়েও গেছে। হঠাৎ দর্শকরা গেটের দিকে তাকিয়ে হাততালি দিচ্ছে। তাদের চোখ সুনীল পাণ্ডার দিকে। পাণ্ডা কোর্টের পাশে একটা চেয়ার দখল করে বসল। হ্যাঁ—সারা ভারতে সুনীল পাণ্ডা একটি দেখার মত ব্যক্তিই। ভারতের যেখানেই সে যায়, দেখা যাবে প্রায় শ'পাঁচেক লোক সব সময় ঘিরে রয়েছে। দশাসই চেহারা, সাত ফুট সাড়ে তিন ইঞ্চি লম্বা, ১৩৪ কেজি অর্থাৎ প্রায় সাড়ে তিন মণ ওজন। সম্ভবত শুধু ভারতেই নয়, সারা এশিয়ায় দীর্ঘতম বাস্কেটবল খেলোয়াড় এই সুনীল পাণ্ডা। সুনীল পাণ্ডার জুতো দেখে টনি গ্রেগ বলেছিলেন, ওর জুতো ছোটখাটো সুটকেশের মতো। সুনীল যখন টিসকোর হয়ে হংকং-এ খেলতে গিয়েছিল, তখন বাটা কোম্পানিও পায়ের মাপ নিয়ে ঠিক মতো অর্ডার সাপ্লাই দিতে পারেনি। আমি সুনীলের পাশে একটা চেয়ার দখল করে বসলাম। এমন সময় বাংলার একজন একটা সুন্দর বাস্কেট করলো। একটা প্রবাদ আছে, একহাতে তালি বাজে না। কিন্তু লক্ষ্য করলাম, সুনীল পাণ্ডা একহাতে তালি বাজিয়ে দেখিয়ে দিল সেই একমাত্র লোক যে একাজ করতে পারে। ওর হাতের আঙুলগুলো অস্বাভাবিক লম্বা আর আখের গোড়ার মত মোটা। ও যখন কোর্টে খেলতে নামে তখন মনে হয় একটা চলমান টাওয়ার কোর্টে ঘোরাফেরা করছে। সুনীলের সাইকেল চড়াও বিচিত্র। সাইকেলের সিটটাকে বেঁকিয়ে নব্বই ডিগ্রি এ্যাঙ্গেল করে নেয় অর্থাৎ সিটের সামনের মাথাটা একবারে উপরের দিকে তুলে নিয়ে তার ওপর বসে সাইকেল চালায়। ১৯৭৪ সালে দিল্লিতে জাতীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় বাঙলা ও বিহার দল একসঙ্গে একই কামরায় রওনা হয়েছিল। রাত্তিরের খাওয়া সেরে সুনীল উপরের বার্থে শুতে গেল। সেখানেও মুশকিল। বাধ্য হয়ে সুনীলকে লম্বা করে পা ছড়িয়ে দিতে হল। স্লিপারের মাঝখানে যাতায়াতের প্যাসেজ, তার পাশে আবার দুটো বার্থ থাকে। উপরের বার্থে শুয়ে সে পা দুটো রাখল কামরার অপর দিককার দেওয়ালে অর্থাৎ কামরার একদিকে মাথা, অন্যদিকে পা। এইভাবে তাকে ট্রেনে চলতে হয়। সুনীল বলল, কাঁহাতক আর এইভাবে যাওয়া যায়। বর্ধমানে প্রি-এশিয়ান বাস্কেটবলে ওখানকার কর্মকর্তারা পড়েছিলেন মুস্কিলে। হাসপাতালে খোঁজ নিয়েও অতবড় খাট তার জন্য জোগাড় করতে পারা গেল না। বাধ্য হয়ে তারা সাড়ে সাত ফুটের একটি খাটের অর্ডার দিয়েছিলেন সুনীল পাণ্ডার জন্য। সুনীল জানাল, হংকং-এ সর্বত্র ওই একই অবস্থা। রাস্তা দিয়ে হাঁটা যায় না। সবাই মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকে আর সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে। একদিন এক ট্যাক্সিওয়ালা ট্যাক্সি চালাতে চালাতে তাকে ঘুরে দেখছে আর ট্যাক্সি চালাচ্ছে, খানিক দূর গিয়ে হঠাৎ ট্যাক্সিটা দু'পাক ঘুরে দাঁড়িয়ে গেল। সুনীল দৌড়তে দৌড়তে ট্যাক্সির কাছে গিয়ে দেখল, ট্যাক্সিওয়ালা ট্যাক্সিতেই বসে আছে। অন্য একটা গাড়ির সঙ্গে সে এ্যাকসিডেন্ট করেছে। কিন্তু বরাত ভালো কিছু হয়নি। সুনীল তাকে বললো, কি, দেখার ইচ্ছা থাকলে দেখ না। বিপজ্জনক ভাবে গাড়ি চালিও না। ও আর একটা মুস্কিলে পড়ে সিনেমা বা থিয়েটারে গেলে। পিছনের সিটের সকলেই বলতে থাকে—দাদা কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

ও একদিন সত্য-সত্যিই বিপদে পড়েছিল। যখন কিছু ছেলে ওকে জিজ্ঞাসা করেছিল, সুনীলদা ওপরের হাওয়াটা কিরকম? জামসেদপুরে একবার দেখেছিলাম অনুশীলনের সময় হঠাৎ ও বল ছেড়ে দিয়ে মজা করবার জন্য একটি বাচ্চা ছেলেকে তুলে রিং-এর মধ্যে দিয়ে গলিয়ে আবার তাকে নামিয়ে দেয়। এরকম কত বিচিত্র গল্প আছে সুনীলকে নিয়ে।

বিহারের হয়ে খেললেও সুনীলের বাড়ি মেদিনীপুরের চোরচিতা গ্রামে। ১৯৪৮ সালে জন্ম ওই গ্রামেই। পিতার নাম উমেশচন্দ্র পাণ্ডা এবং মা ইন্দুবালা পাণ্ডা। সুনীলরা চার ভাই, এক বোন। সকলেই দীর্ঘদেহী। ১৯৬৫ সালে সুনীল চাকরির খোঁজে কলকাতায় আসে। কলকাতা পুলিশে সে চাকরিও পায় কিন্তু তার মন টেঁকে না। চলে আসে জামসেদপুরে। ১৯৬৭ সালে টিসকোয় যোগ দেয়। সটপাট ও ডিসকাস কেমন করে ছুঁড়তে হয় তাই শিখতে লাগল। ওই বছর জাতীয় প্রতিযোগিতায় সে তৃতীয় স্থান পায় ডিসকাসে। ১৯৭৩ সালে পি এন শঙ্করণ (বর্তমানে বাস্কেটবল ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ার সম্পাদক) তাকে বাস্কেটবল খেলার জন্য উৎসাহিত করেন। ১৯৭৩ সাল থেকেই সে নিয়মিত বিহার দলে খেলে আসছে। ১৯৭৬ সালে সুনীল ভারতীয় দলে প্রথম চান্স পায়। কিন্তু ভারত সরকার অনুমতি না দেওয়ায় ভারতীয় দলের বাইরে যাওয়া হয়নি। ১৯৭৭ সালে কুয়ালালামপুরে নবম এশীয় বাস্কেটবলে সুনীল পাণ্ডা ছিল ভারতের এক নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড়। থাইল্যাণ্ডের সঙ্গে ৫১ পয়েন্ট করে একটি ম্যাচে এশিয়ার সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় নিজের নামটি সে খোদাই করে রেখেছে। ১৯৭৫ সালে বাঙ্গালোরে জাতীয় প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে রেল দলকে পরাজিত করেছিল বিহার, যার মধ্যে সে করেছিল ৫৫ পয়েন্ট। সম্ভবত এইটিই ওর জীবনের শ্রেষ্ঠ খেলা। গত দু'বছর ধরেই সুনীলের বিয়ের কথা হচ্ছিল। কিন্তু অত লম্বা মেয়ে, বাঙলায় খুঁজে পাওয়া যায় না। বাঙলার বাইরেও খোঁজ খবর চলল। সুনীল লজ্জার সঙ্গে বলল, বছর খানেক হল দার্জিলিঙে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ফেরার পথে মালদায় খুড়তুত দাদার ওখানে একদিন ছিলাম। সেখানেই অর্চনার সঙ্গে দেখা হয়। কথাবার্তা পাকা হয়ে গেল। বাড়িতে মা-বাবাকে গিয়ে বললাম। অর্চনার সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল ২৪ ফেব্রুয়ারি। সুনীলের পাশের চেয়ারে বসা অর্চনাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার হাইট কত? সে বলল, পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি। অর্চনা আরও বলল, সুনীল খুব স্লো। তাই ওকে বলি নিয়মিত আরো বেশি প্র্যাকটিস কর—হংকং-এ অনুষ্ঠিত আগামী দশম এশীয় বাস্কেটবলে ভারতের স্থান যাতে প্রথম অথবা দ্বিতীয়ের মধ্যে থাকে।

দ্বিজুদার আশেপাশে

আশ্চর্য সম্বর্ধনা

দিগদর্শক ঃ দ্বিজুদা একদিন হাতিবাগান অঞ্চল দিয়ে যাচ্ছেন। রাত তখন নটা হবে। দ্বিজুদার পুরনো বন্ধু রামপ্রসাদের বাড়িতে তার নেমন্তন্ন। খেলার পরই যাওয়ার কথা, কিন্তু রাস্তায় দলীয় সমর্থকদের খেলোয়াড়সুলভ কাণ্ডকারবার দেখে তিনি একটু থামাতে গিয়ে হয়ে গেল গোলমাল। প্রায় রোজই অবশ্য তিনি বাড়ি ফেরার সময় দলীয় সমর্থকদের খেলোয়াড়সুলভ কাণ্ডকারবার দেখেন। কিন্তু সে তিনি দেখেও না দেখার ভান করেন। একদিন খিদিরপুরের ট্রামে উঠে চলেছেন। হঠাৎ খেলা শেষ হতেই প্রায় তিন হাজার খেলোয়াড়সুলভ ছোকরা সেই ট্রামটিকে ছেঁকে ধরলো। ফার্স্ট ক্লাস,সেকেণ্ড ক্লাসে মিলে প্রায় দেড়শো জন ভেতরে ঢুকে গেল, আর অনেকে জানালা ধরে বাইরে প্রায় ঝুলতে ঝুলতে চলতে লাগল এবং ট্রামের ভেতরের লোকদের অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করতে লাগল। কিন্তু ছোকরাদের অসভ্যতা থামাতে দ্বিজুদার বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখা গেল না। তিনি দেখলেন একটি ছোকরা একজন ভদ্রলোকের কান মলে দিল। তার অপরাধ তিনি বলেছিলেন, কানের কাছে অতখানি চিৎকার কি উচিত হচ্ছে? বাস্ এই সাংঘাতিক একটা কথায় ছোকরারা একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল। একজন বলল, এইসব লোকের জন্যই দেশটা উচ্ছন্নে গেল। একটু স্পোর্টসম্যান স্পিরিট নেই রে! একজন বলল, এমন লোক দেশের কলঙ্ক। দে ওর দুটো কান মলে। ভদ্রলোক কি বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু ছোকরাদের চিৎকারে সে আর শোনা গেল না। এক ভদ্রলোক বললেন, ব্যাপার কি, দেশে কি পুলিস নেই? তা শুনে কে যেন বললেন, তা থাকবে না কেন, তারা এখন নিজেদের মাইনে বাড়ানোর মহৎ কাজে ব্যস্ত। এরই মধ্যে একটি ছোকরা জানালার পাশের সেই আপত্তিকারী ভদ্রলোকের কান মলে দিল।

আর দ্বিজুদা তাই দেখলেন। তিনি ভদ্রলোকের পাশেই বসে নিজের চোখেই দেখলেন। তিনি আরও দেখলেন, ট্রামের জানালায় ঝুলতে ঝুলতে একটি ছোকরা পকেট থেকে কি একটা বার করে খানিক খেয়ে নিয়ে বলে উঠল, জয় আমাদের দলের জয়। অমুক দল গোল্লায় যাক। আজ তিন গোলে হারিয়েছি, পরশু সাতাশ গোলে হারিয়ে ভূত ভাগিয়ে দেব।

মাকালী! ও মাকালী! বলতে বলতে আর একটি ছোকরা প্রথম ছোকরার কাছ থেকে টেনে নিয়ে নিজের মুখে দিল। সে বলল, জয় পুলিশের জয়! কিন্তু এসব দেখে শুনেও দ্বিজুদা কিছু করেননি। তিনি মনে মনে



বললেন, হুঁ বাবা—মন্বন্তরে মরিনি আমরা মারী নিয়ে ঘর করি। আমরা যে বাঙালী! আমরা আগামী সমস্ত যুগ ধরে বেঁচে থাকব। দ্বিজুদা মনে মনে ভাবলেন, তবে একেবারে বীরের মত না হলেও বেঁচে থাকা যাবে—যেমন কিনা আরসোলারা বেঁচে থাকে। যেমন করে বেঁচে থাকে জোনাকিরা। আরশোলা নয়, জোনাকি। জোনাকি, যে কিনা আলো দেয়।

শাট আপ! দ্বিজুদার বিবেক বিদ্রোহ করে বলে উঠল। সে দ্বিজুদাকে শাসিয়ে বলল, ইউ কাওয়ার্ড। কোনো ক্ষমতা নেই—কিছু নেই। কয়েকটা ছোকরার অসভ্যতাকে চূর্ণ করার কোনো সাহস পর্যন্ত নেই। জোনাকির মত বেঁচে থাকতে চাও তুমি। তাতে গৌরব বাড়বে? মানুষ, মানুষের মত বাঁচতে চাও না? দ্বিজুদার বিবেক এই সব বলাতে দ্বিজুদা কি রকম একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। তিনি একবার ভাবলেন উত্তেজিত হয়ে উঠে একটা ছোকরার নাকে ঘুসি বসিয়ে দেন। কিন্তু তাতে বোধহয় আইন ভঙ্গ করা হবে। আফটার অল, দ্বিজুদা ভাবলেন এসব করার কোনো মানে হয় না। কিন্তু হঠাৎ কি হল, কেন কে জানে, একটি ছোকরা ট্রামের মধ্যেই থু থু ফেলতে গেল আর তা লেগে গেল দ্বিজুদার মুখে।

দ্বিজুদা আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। এ দিকে কিছুক্ষণ ধরেই তার বিবেক খুব তাকে ওসকাচ্ছিল। তিনি এক আজব কাণ্ড করে ফেললেন! তিনি ঝুঁকে পড়ে ওই ছেলেটির লম্বা লম্বা চুল এক হাতে ধরে অন্য হাতে নাকের উপর ধাঁই করে একটা ঘুসি বসিয়ে দিলেন। সে যেন একটা বিপ্লবই হয়ে গেল! ছেলেটির নাক থেকে রক্ত পড়তে লাগল। সে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল, ওরে তুষার রে, সৌম্য রে, আমার এই অপমানের প্রতিশোধ তোরা নিচ্ছিস না কেন রে? কিন্তু ছোকরাদের আর সাড়া নেই। ষোলো জন ট্রাম ধরে ঝোলা ছোকরা তারপরের স্টপেজে দুম দাম নেমে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। গত তিন বছর যাবত তারা এইরকম কাণ্ড প্রায় প্রত্যেক খেলার দিন করে আসছে—কিন্তু এরকম কাণ্ড কখনো ঘটেনি। যে ছেলেটির নাক দিয়ে রক্ত পড়ছিল, সে বলল, দেখে নেব একবার আমাদের পাড়ায় এলে! দ্বিজুদা বললেন, কই কে বলছিস কথাটা? তুই? বলে পকেট থেকে একটা পেন বার করে তার মুখের মধ্যে সেটাকে পুরো ঢুকিয়ে দিতেই ছোকরাটা ওয়াক ওয়াক করতে করতে ট্রাম থেকে লাফিয়ে কোথায় পালিয়ে গেল।

এরপর ট্রামের লোকেরা দ্বিজুদার সমর্থনে এগিয়ে এলেন। তারা বললেন, কে বলে বাঙালীর স্পিরিট গেছে? এই তো রয়েছেন উনি। কয়েকজন বললেন ওকে কালীঘাটে নামিয়ে সম্বর্ধনা দেওয়া হবে। দ্বিজুদা বললেন, না—না ওসব থাক। কিন্তু কে কার কথা শোনে। দ্বিজুদাকে কালীঘাটে দারুণ এক এক্সটেম্পোর সম্বর্ধনা দেওয়া হল। একটা ফুলের মালা তিনি তো পেলেনই, এছাড়া তার জন্য পাড়া থেকে দুশো কুড়ি টাকা চাঁদাও তোলা হয়ে গেল ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই, আঃ চমৎকার লুচি আর মাংস।

শেষ পর্যন্ত তাই দ্বিজুদার রামপ্রসাদের বাড়িতে যেত অত দেরি হয়ে গেল। ●

বিশেষ ফুটবল সংখ্যায় হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 'গত একবছরে ইস্টবেঙ্গল' লেখাটির এক জায়গায় আছে—'গতবার ইস্টবেঙ্গল লিগ এবং ফেডারেশন কাপ ছাড়া আর কিছুই পায়নি।' অংশটির কিছুটা ভুল ছাপা হয়েছে। ৭৭-এ ইস্টবেঙ্গল ফেডারেশন কাপে খেলতে যায়নি। চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল আই টি আই। এরজন্য আমরা দুঃখিত।

—সম্পাদক

ঢাকাতেও লোডশেডিং : ফ্লাডলিট ফুটবল বন্ধ



ঢাকায় লিগ : মোহামেডান ও ফায়ার সার্ভিসের খেলায়/খন্দকার তারেক

ঢাকা থেকে আব্দুল তৌহীদ : ঢাকা এখন জমজমাট। ফুটবল, ফুটবল আর ফুটবল। দুপুরটা গড়ালেই মানুষের ঢল নামছে স্টেডিয়ামে। পুরোন শহরের পোস্তগোলা, গেণ্ডারিয়া, যাত্রাবাড়ী থেকে শুরু করে নতুন শহরের ধানমণ্ডি, বনানী, গুলশান থেকে ঢাকা স্টেডিয়াম পর্যন্ত নিত্যি আনাগোনা শুরু হয়েছে ফুটবল আমুদে দর্শকদের। ফুটবলের উত্তেজনায় উদ্দীপ্ত হতে, ফুটবলের কড়া টানে দারুণ গরমকে তুচ্ছ করে সবাই জড়ো হচ্ছেন ঢাকা স্টেডিয়ামে। কখনও বিকেল পৌনে পাঁচটা থেকে আশি মিনিটের একটা খেলা শেষ করে আবার টিকেট কেটে ফ্লাড লাইটে দ্বিতীয় বারের মত আর একবার ফুটবলের হাজিরা দিয়ে রাত পৌনে ন'টা নাগাদ বাড়ী ফেরা। এমনি ভাবেই চলছিল একটানা মের শুরু থেকে শেষদিন পর্যন্ত।

এ বছর ঢাকায় গরম পড়েছে দারুণ। আর এই দারুণ রোদ্দুরের মাঝে প্রথমবারের মত শুরু হয়েছে লোড শেডিং ঢাকায়। রোদ্দুরকে পাশ কাটাতে এক টাকা কিংবা দু'টাকা দিয়ে স্টেডিয়ামের ফাঁকা গ্যালারিতে জমা হলেও তেমন চুটিয়ে খেলা দেখার মত ফুটবল এখনও একটা ম্যাচেও দেখা গেল না। তবু আশা নিয়ে দর্শকরা মাঠে এসেছেন আর নিত্যি সাদামাটা খেলা দেখে পয়সা নষ্ট করে অবসাদ গ্রস্থ হয়ে ফিরে গেছেন। নামী, দামী ফুটবলার সমৃদ্ধ বড় দল থেকে শুরু করে মাঝারী, ছোট কোন দলই তেমন আকর্ষণীয় ফুটবল উপহার দিতে পারেনি এ যাবত। তবে ঘটনা ঘটেছে আর সে কথায় আসছি পরে। কিন্তু তারও আগে বলি এবারে ফুটবলের দল গড়তে টাকা খরচ হয়েছে প্রচুর, অনুশীলনে, ক্যাম্প চালাতেও কম খরচ হচ্ছে না কোন ক্লাবের। তবু মাঠে নেমে ছেলেরা কেউই খেলতে পারছেন না। গরম একটা কারণ হলে বলতে হয় ফুটবল তো গরমকালেরই খেলা। আর দামী খেলোয়াড়দের কথা বলতে গেলে বলতে হয় এক মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব আর আবাহনী ক্রীড়া চক্র ছাড়া আর কোন দলের দামী খেলোয়াড়রা যারা এবারে দল বদল করেছেন, এখনও হয় খেলেননি, না হয় খেলায় তেমন কুশলী খেলোয়াড়োচিত খেলা উপহার দিতে পারেননি।

দলগত হিসাবে যারা এখন পর্যন্ত ভালো করে যাচ্ছেন তারা গতবারের লিগ বিজয়ী মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। গত লিগের মত এবারেও তারা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য শুরু থেকেই সতর্কতার সঙ্গে খেলে যাচ্ছেন। আর যার ফলে এখনও পর্যন্ত তারা কোন পয়েন্ট খোয়াননি। লিগের মোট ষোলটা খেলার মধ্যে ইতিমধ্যে তারা পাঁচটা খেলা সাঙ্গ করেছেন।

গতবারের লিগের রানার্স দল ব্রাদার্স ইউনিয়ন। মূলত এটা ঢাকার অপরাপর আর কয়েকটা প্রথম বিভাগ দলের মতো পাড়ার দল। ব্রাদার্স ইউনিয়ন ক্লাব গোপীবাগ এলাকায় অবস্থিত। এ ক্লাব গোপীবাগ হাটখোলা, মতিঝিলের অংশ বিশেষ রামকৃষ্ণ মিশন রোড, গোপীবাগ আর স্বামীবাগ পাড়ার একান্তই নিজেদের দল। পাড়ার ছেলেরাই এ ক্লাবের খেলোয়াড়। ফুটবলের প্রতি ছেলেদের ঝোঁক, অনুশীলনে আগ্রহ তাদের দলকে ঢাকা ফুটবলের উন্নতির সোপানে এনে দিয়েছে। এ ক্লাবের ছেলেরা যখন ভালো খেলেন নামী দামী ক্লাবের নজরে পড়ে, আর তারপর টোপ ফেলা হয় তাদেরকে নিজেদের দলে খেলানোর জন্য। এমনই এক অবস্থার শিকার হয়েছিলেন ব্রাদার্সের তুখোড় খেলোয়াড় জাতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক মহসীন। অফিস দলের মধ্যে অন্যতম ধনীদল বি জে আই সি এবারের লিগে মহসীনকে প্রায় নিয়েই নিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্রাদার্স ইউনিয়ন মহসীনকে যেতে দেয়নি। কিন্তু ব্রাদার্সের ওই যেতে না দেওয়া বি জে আই সি-র না ছাড়তে চাওয়ার টানা পোড়েনে বেচারী মহসীন এই এক মাস খেলা চললেও একদিনও খেলতে পাননি। ব্রাদার্স ইউনিয়ন সূত্রে জানা গেছে আগামী খেলায় মহসীন নিজ দলের পক্ষে খেলবেন। দেখা যাক কি হয়। মহসীন ছাড়াই ব্রাদার্স এযাবত খেলেছে এবং খেলায় হারেনি ঠিকই কিন্তু সব খেলাতে তারা জিততেও পারেনি, পয়েন্টও খুইয়েছে দুটো।

রহমতগঞ্জ এম এফ এস লিগ টেবলের ওপর দিকের দল। এবারে নিজেদের অবস্থাকে আরও ভালো করতে একাধিক দল থেকে একাধিক চৌকস খেলোয়াড়দের নিয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে সেরা খেলোয়াড় বলে যাকে তারা নিয়েছে, সেই ডিফেণ্ডার মঞ্জু এখনও রহমতগঞ্জের পক্ষে একটা খেলাতেও অংশ নিতে পারেননি। মঞ্জুর জণ্ডিস হয়েছে। আরও এক মাসে তিনি মাঠে নামতে পারবেন তেমন ভরসা নেই। মঞ্জু ছাড়াই রহমতগঞ্জকে মাঠে নামতে হচ্ছে। খেলায় তেমন ভালো ফল সম্ভব হয়নি তাদের পক্ষে।

আবাহনী ক্রীড়া চক্র প্রথম খেলতে নেমে নেহাতই খারাপ খেলেছে। ইস্ট অ্যাণ্ড ক্লাবের সঙ্গে ড্র করে পয়েন্ট খুইয়েছে। ফায়ার সার্ভিসের বিরুদ্ধে খেলা মুলতুবী না হলে তাতেও পয়েন্ট খোয়ানোর সম্ভাবনা ছিল প্রচুর। কিন্তু মনে হচ্ছে তারা নিজেদের অবস্থাকে বুঝতে সক্ষম হয়েছেন। যার দরুন তাদের খেলার ধারায় কিছুটা উৎকর্ষতার আমেজ পাওয়া গেছে—পর পর দুটো খেলাতে তারা উৎসাহ ব্যাঞ্জক ফুটবল উপহার দিয়েছেন ঢাকার দর্শকদের।

এইভাবে চলছে ঢাকায় ফুটবল। অতএব মোদ্দা কথায় বলা চলে বাংলাদেশের জনপ্রিয় খেলা ফুটবল জেলুস হারিয়েছে। আর জেলুস আনা যাদের দায়িত্ব তারাও যে খুব একটা চেষ্টা চালাচ্ছেন এমন মনে হচ্ছে না। সত্যি বলতে কি—ঢাকা ফুটবলে নতুন মুখ নিত্য এলেও সম্ভাবনাময় ফুটবলের কেন ইঙ্গিতই থাকছে না তাদের খেলায়। অ... পরিতাপের বিষয় হলেও একথা সত্যি যে ষাট দশকের শেষ দিকের খেলোয়াড়রাই এখনও দাপটে ফুটবল খেলে যাচ্ছেন ঢাকা মাঠে। আবাহনীর বৃদ্ধ শামসু, ষাটদশকের তরুণ সালাহউদ্দিন, মোহামেডানের এনায়েত এখনও সেরা স্ট্রাইকার। ওয়াণ্ডারাস-এর বাটু, রহমতগঞ্জের মঞ্জু এখনও সেরাদের মধ্যে অন্যতম ডিফেণ্ডার। গোলরক্ষক মান্টু এখনও সেরা। আর আবাহনীর নান্নু—ফুটবলের সঠিক প্রয়োগে এখনও অনন্য। আর এরা সবাই বর্তমানে খেলা ছেড়ে দেওয়ার বয়সে এসে পড়েছেন—এদের অনেকেই জাতীয় দলে নিজেদের মনোনয়নে অনীহা জানিয়েছেন—জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের খেলার জন্য রিটায়ার করেছেন কিন্তু এদের স্থলাভিষিক্ত করার জন্য যোগ্য তরুণদের এখনও আগমন ঘটেনি ফুটবলে। অতএব কোন ফুটবল রসিক যদি বলেন যে ফুটবলের আঁতুড় ঘর আজ আতুর হয়ে পড়েছে, খুব একটা অন্যায় কিছু বলবেন না।

যে সমস্ত খেলোয়াড়দের কথা বললাম তাদের বদলে আজকে যাদেরকে কিছুটা সম্ভাবনাময় বলে মনে হচ্ছে তারা হলেন আবাহনীর রক্ষণভাগের খেলোয়াড় টুটুল, আক্রমণ ভাগের চুন্নু, বাবুল, ব্রাদার্সের স্ট্রাইকার মহসীন, বাবুল, মোহামেডানের মোসাব্বির ইউসুফ, বি জে আই সি-র হাসান, ভিক্টোরিয়ার আসলাম, রহমতগঞ্জের হালিম। কিন্তু এখনই এদের মনে হচ্ছে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন—পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। দায়িত্ব নেওয়া ঝক্কি সামাল দেওয়ার মত এত শক্ত ওরা এখন হননি।

যে কথা বলতে গিয়েও তখন বলিনি এখন সেই ঘটনায় আসা যাক। সেদিন ছিল ১ জুন। প্রথম ক'দিন প্রত্যেকদিন একটা করে খেলা হলেও ঢাকা ফুটবলের ব্যবস্থাপকগণ লিগ শেষ করার তাগিদে পরবর্তী দিনগুলোতে দুটো করে খেলা চালানোর ব্যবস্থা করেন এবং সে হিসেবে কখনও একটা বিকেলে, একটা সন্ধ্যায়, কখন ওরা সন্ধ্যার আগে একটা খেলা শুরু করে পরপর দুটো খেলা শেষ করা হয়েছে একই দিনে। অবশ্য তার জন্য ফ্লাড লাইটের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। আর এই ফ্লাড লাইটই বিপত্তি ঘটিয়েছিল যত।

আগেই বলেছি ঢাকায় নতুন জিনিস লোড শেডিং! আর দুর্ভাগ্যবশত যে কদিন ফ্লাড লাইটে খেলা হয়েছে সে কদিন পুরোন শহরে বেশ কিছু এলাকা থেকেছে অন্ধকার। আর তারই ফলশ্রুতিতে প্রচুর সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন ফুটবল ব্যবস্থাপকগণ। কথা চলছিল কিভাবে সবদিক সামাল দিয়ে বিদ্যুৎ খরচ কম করা যায় কিংবা প্রয়োজনে ফ্লাড লাইটে খেলা বাতিল করা যায়। কিন্তু কোন একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই ব্যবস্থাপকগণ ১ জুনের বিকেলের খেলা চলার মাঝেই ঘোষণা করলেন সেদিন থেকেই রাতে খেলা বন্ধ। যারা পরপর দুটো খেলা দেখার জন্য ডবল দামে টিকিট কিনে মাঠে ঢুকেছিলেন তাদের বলা হল—তাদের কাছে ফেরৎ দেওয়া টিকিটের অংশ দিয়ে অপর একদিনের খেলা দেখতে পাবেন। দর্শকরা খুশী হননি এ সিদ্ধান্তে। খুশী না হওয়ার পিছনে যুক্তি ছিল জোরদার। যাক সেটা আমার কথা নয় অতএব বিকেলের খেলা হল ভণ্ডুল। ইঁট পাটকেল সামলাতে রেফারি খেলা পরিত্যক্ত ঘোষণা করলেন। কুফা লাগলো ফুটবলে ভিক্টোরিয়া-বি জে আই সির খেলা হল। রাতের খেলা ছিল আবাহনী ক্রীড়াচক্র আর আজাদ স্পোর্টিং ক্লাবের মধ্যে। ইঁট পাটকেল কিংবা খেলা ভণ্ডুল দিয়েই ঘটনা শেষ হল না। কিছু সংখ্যক উত্তেজিত দর্শক ভাঙচুর করলেন স্টেডিয়ামের সম্পত্তি। সাংবাদিকদের গ্যালারির পিছন দিকে অর্থাৎ স্টেডিয়ামের পশ্চিম দিকের গ্যালারির মাথার রেলিং ভাঙা হল—ভাঙলো বেশ কিছু জানলার কাঁচ। স্টেডিয়ামের সদর দরজায় সাজানো কাঠের গেটে আগুন লাগানো হল—অতএব ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি এলো কিন্তু ক্রুদ্ধ জনতা তাদের গতি রোধ করলো—আগুন নেভাতে দিলো না। শেষে পুলিশ জনতা ছত্রভঙ্গ করতে, শান্তি ফিরিয়ে আনতে প্রথমে লাঠি নিয়ে তাড়া করলো। মৃদু লাঠি চার্জও করা হল—না তবু জনতা ছত্রভঙ্গ হয়নি। আক্রোশে পুলিশের দুটো মোটর সাইকেলে আগুন লাগালো। অতএব পরপর যা হয় কাঁদানে গ্যাস ছড়ালো—জনতা রুমাল ভিজিয়ে চোখ মুছতে মুছতে ছত্রভঙ্গ হল সেদিন। রাতের খেলা তো বন্ধ হলোই, তারপর থেকে কিন্তু কেন এমনটা হল তা নির্ণয় করতে এখন এনকোয়ারি কমিটি বসেছে। দেখা যাক রিপোর্ট কি আসে।

দল	খেলা	জয়	ড্র	হার	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েন্ট
রহমতগঞ্জ এম এফ এস	৫	৪	১	০	১১	৩	৯
মোহাম্মেডান স্পোর্টিং ক্লাব	৪	৪	০	০	১২	০	৮
ব্রাদার্স ইউনিয়ন	৫	২	৩	০	৮	২	৭
ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব	৪	৩	০	১	৭	৩	৬
বি জে আই সি	৪	২	২	০	৭	৫	৬
ওয়াণ্ডারার্স ক্লাব	৪	২	২	০	৫	৩	৬
ওয়াপদা	৬	১	৪	১	৫	৪	৬
আবাহনী ক্রীড়াচক্র	৩	২	১	০	৭	১	৫
ধানমণ্ডি ক্লাব	৬	৩	১	২	৬	১৩	৪
পুলিশ ক্লাব	৫	১	২	২	৩	৪	৪
সাধারণ বীমা	৬	১	২	৩	৫	৮	৪
দিলকুশ স্পোর্টিং ক্লাব	৬	০	৩	৩	৩	৬	৩
আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব	৫	১	১	৩	২	৬	৩
ইস্ট-এণ্ড ক্লাব	৬	০	৩	৩	১	৯	৩
ওয়ারী ক্লাব	৪	০	২	২	৩	৬	২
ফায়ার সার্ভিস	৪	১	০	৩	৪	৭	২
পি ডব্লু ডি	৫	০	১	৪	৪	১৩	১

২ জুন থেকে প্রত্যেকদিন বিকেলে একটা করে খেলা চলছে আর রাতের খেলা বন্ধ। ফ্লাড লাইটের ব্যবহার স্থগিত রাখা হয়েছে বর্তমানে।

ঢাকায় ফুটবল কেমন চলছে তাতো আগেই বলেছি। বড় টিমরা বিজয়ী হচ্ছে, পয়েন্ট পাচ্ছে কিন্তু বড় টিমের মত বড় রকমের খেলা দেখিয়ে নয়। ছোট মাঝারী দলগুলো হয় জিতছে, নয় হারছে আর তা না হলে ড্র করে পয়েন্ট ভাগাভাগি করছে। মোদ্দা কথা ঢাকার ফুটবলে জৌলুস নেই, উৎকর্ষতা নেই, চমৎকারিত্ব নেই, ব্যক্তিগত ক্রীড়া নৈপুণ্যের দর্শনও মেলেনি এ যাবত। তবে তাই বলে ঢাকা স্টেডিয়ামে ফুটবল আমুদে দর্শকদের ঘাটতি নেই। উৎসাহেও ভাঁটা পড়েনি একটুও।

দ্বিতীয় বিভাগ ফুটবলও শুরু হয়েছে ১৫ জুন ঢাকা স্টেডিয়ামের বাইরে দেওয়াল ঘেরা পুরোন পল্টন ময়দানের তিনটি মাঠে যার এখনকার নাম আউটার স্টেডিয়াম। মোট ১৬টা দল এবারের দ্বিতীয় বিভাগ লিগে অংশ নিচ্ছে। আর প্রত্যেকদিন তিনটে করে খেলা চলছে।

এ যাবত খেলায় সবচেয়ে বেশী গোল দিয়েছেন মোহাম্মেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বাদল আর আবাহনী ক্রীড়াচক্রের সালাহউদ্দিন। এরা দুজনেই ৪টা করে গোল করেছেন।

খেলা বন্ধ হয়েছে—বি জে আই সি বনাম ভিক্টোরিয়া দুবার। প্রথম দিন ১ জুনের ঘটনায় আর দ্বিতীয় দিন বৃষ্টির জন্য। দু দিনই বি জে আই সি এগিয়ে ছিল। মোহাম্মেডান আর ওয়াণ্ডারার্স ক্লাবের খেলাটিও আলোর দরুন পরিত্যক্ত হয়েছে। অবশ্য মোহাম্মেডান দল সেদিন ৩—০ গোলে এগিয়ে ছিল।

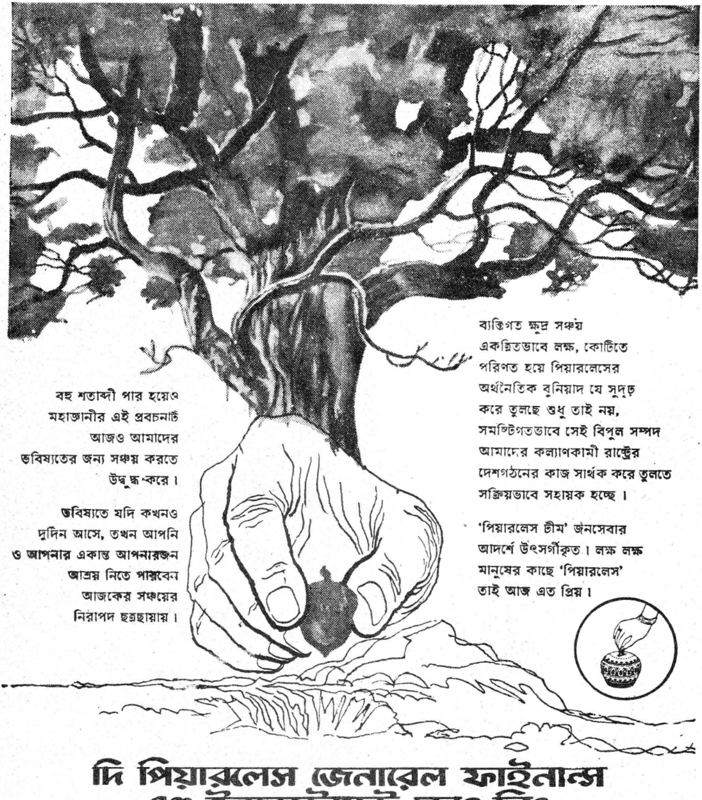
চীনের হ্যাংচাউ-এ অনুষ্ঠিত বিশ্ব ব্যাডমিণ্টনে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশ দল দাঁড়িয়ে বাঁদিক থেকে—জিলানি, আলম, হাসেম ও পেনু। বসে মরিয়ম, সবিনউদ্দীন আহমেদ (ম্যানেজার) ও ডানা।



অন্যান্য খেলা

ফুটবল ছাড়া ঢাকায় এখন চলছে মেট্রোপলিশ টেবল টেনিস লিগ। ঢাকার বাইরে এখন বাংলাদেশের জাতীয় পর্যায়ের দুটো দল অবস্থান করছে। বিশ্বকাপ ক্রিকেটে অংশ নিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়নশিপ খেলায় ৫ দেশের মধ্যে ফিজি আর মালয়েশিয়াকে হারিয়ে তৃতীয় হয়ে বিদায় নিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল ইংল্যাণ্ডে। আর চীনের হ্যাংচাউ-এ অনুষ্ঠিত বিশ্ব ব্যাডমিণ্টনে আজ পর্যন্ত পাওয়া খবরে জানা গেছে বাংলাদেশ কেনিয়া আর মরিশাসকে হারিয়েছে। ব্যাডমিণ্টনে যারা বাংলাদেশ দলের হয়ে চীনে গেছেন তারা : মনসুর আহমেদ খান (পেনু), গোলাম আজিজ (জিলানী) মনোয়ারুল আলম (বাবুল) ও সেখ আবুল হাশেম। মহিলাদ্বয় হলেন, মরিয়ম সিদ্দিক আর ডানে কামরুন্নাহার ডানা। দলের ম্যানেজার হয়ে গেছেন জনাব সবিনউদ্দীন আহমেদ।

উত্তরপুরুষেরা লাভবান হবে বলেই তিনি বৃক্ষরোপন করেন……… সিসেরো



বহু শতাব্দী পার হয়েও মহাজ্ঞানীর এই প্রবচনটি আজও আমাদের ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করতে উদ্বুদ্ধ করে।

ভবিষ্যতে যদি কখনও দুর্দিন আসে, তখন আপনি ও আপনার একান্ত আপনারজন আশ্রয় নিতে পারবেন আজকের সঞ্চয়ের নিরাপদ ছত্রছায়ায়।

ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র সঞ্চয় একত্রিতভাবে লক্ষ, কোটিতে পরিণত হয়ে পিয়ারলেসের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ যে সুদৃঢ় করে তুলছে শুধু তাই নয়, সমষ্টিগতভাবে সেই বিপুল সম্পদ আমাদের কল্যাণকামী রাষ্ট্রের দেশগঠনের কাজ সার্থক করে তুলতে সক্রিয়ভাবে সহায়ক হচ্ছে।

'পিয়ারলেস টীম' জনসেবার আদর্শে উৎসর্গীকৃত। লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে 'পিয়ারলেস' তাই আজ এত প্রিয়।

দি পিয়ারলেস জেনারেল ফাইনান্স এণ্ড ইনভেষ্টমেন্ট কোং লিঃ

[স্থাপিত ১৯৩২]

রেজিস্টার্ড অফিস : পিয়ারলেস ভবন, ৩, এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলিকাতা-৭০০ ০৬৯

জামশেদপুরে ফুটবল এখন তখন অবস্থায়

অমল ত্রিবেদী ঃ ইস্পাত নগরী জামসেদপুরে ফুটবলই সবচেয়ে জনপ্রিয়। ব্লাস্টফারনেসের কাছে হাড়ভাঙা খাটুনির পর যারা এক সময় বিকালটা ফুটবল মাঠে কাটাতে পছন্দ করতেন—জামসেদপুর স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন তাদের বাড়া ভাতে ছাই ফেলেছেন।

জামসেদপুর ফুটবল লিগ শেষ নিঃশ্বাস ফেলার আগে খাবি খাচ্ছে। যে-কোন দিন সে মুখ থুবড়ে পড়বে। অথচ এমন অবস্থা তো আগে ছিল না। জামসেদপুরের দশ বারটি মাঠে জাঁকিয়ে বসত ফুটবল। হোত লিগ, হোত নক আউট খেলা। অথচ আজ, কালের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় ফুটবল জামসেদপুর থেকে বিদায় নিতে বসেছে।

এজন্য দায়ী কারা? অনেককে জিজ্ঞাসা করেছি। সবার এক জবাব—জি এস এ'র কর্মকর্তারা। সেক্রেটারি তাতা রাও ও প্রেসিডেন্ট পি এস রাও-এর ওপর অনেকে অল্প বিস্তর বিরক্ত। শুনলাম এদের ও অন্যান্য জি এস এ সদস্যদের অকর্মণ্যতার জন্য আজ লিগ বন্ধ। গত বছর লিগ দ্রুত গতিতে চলাকালীন টেলকো বনাম মহঃ-স্পোর্টিং এর খেলায় রেফারির সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট দর্শকেরা স্টেডিয়ামে ভাঙচুর করে এবং খেলা ভণ্ডুল করে দেয়। তারপর আর লিগের কোন খেলার ব্যবস্থা করেনি জি এস এ। অথচ দলগুলি নাকি খেলার জন্য ইচ্ছুক ছিল। এবছরও লিগ এখন-তখন অবস্থায়। এখনো খেলা শুরু হওয়ার কোন প্রস্তুতি দেখা যায়নি। স্থানীয় ফুটবলে দল বদল শেষ হয়েছে। দলগুলি প্রত্যেকে যথাসম্ভব শক্তিশালী দল গড়ে নিয়মিত অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকে মাঠে নামার জন্য দারুণ আগ্রহী। অথচ কেউ এখনো পর্যন্ত জানেন না লিগ ফুটবল আদৌ শুরু হবে কিনা। জামসেদপুরের ফুটবলারদের সামনে জমাট বাঁধা নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। তবুও তারা প্রত্যেকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে প্রয়াস চালাচ্ছে।

বর্তমানে জামসেদপুর লিগে তিনটি ডিভিসনে মোট ২৫টি দল ফুটবল খেলে। 'এ' ডিভিসনে ১১, 'বি' ও 'সি' ডিভিসনে যথাক্রমে ৬ এবং ৮টি করে দল। 'ডি' বিভাগ অর্থাৎ কোয়ালিফাইং রাউণ্ডে অংশ নেয় ১৪টি দল। প্রতি বছর এদের বিজয়ী দল পরবর্তী বছরে 'সি' ডিভিসনে খেলার সুযোগ পায়।

এখানকার ফুটবলে সবচেয়ে পুরনো ক্লাব জামসেদপুর ওল্ড বয়েজ ও সার্কাচ এ সি। স্থানীয় রিগ্যাল মাঠে লিগ ফুটবলের আসর বসে। এটি এখানকার সেরা মাঠ। এছাড়া টেলকো মাঠ, কিনান স্টেডিয়াম, কেরল মাঠ, বেলডি মাঠ, আর্মারি ও সি এন আর মাঠে ফুটবল খেলা হয়। এখানকার ফুটবলে সেরা দল টিসকো, টেলকো, মহঃ স্পোর্টিং, ইণ্ডিয়ান টিউব ও টিন প্লেট। উদীয়মান ও কদমা বয়েজ 'বি' ডিভিসনের সেরা দল। শেষবার লিগ অনুষ্ঠিত হয়েছে ৭৭-এ। 'এ' ডিভিসনে বিজয়ী হয়েছিল ইণ্ডিয়ান টিউব কোম্পানী। যুগ্ম রানার্স হয় টিসকো ও টেলকো। তার আগে পর পর পাঁচ বছর টেলকো লিগ বিজয়ী হয়।

আগে জামসেদপুরে রাজেন্দ্র মোহন ও নারসিয়া কোচিং দিতেন। এখন এরা বাইরে। তাতা রাও মাঝে মধ্যে কোচিং দেন, তবে তা নিয়ম রক্ষার জন্যই। কখনো রমজান মাঠে নামেন। বর্তমানে রেফারিদের সঙ্গে ফুটবল কর্তাব্যক্তিদের মনোমালিন্য সবার কাছে খোলাখুলিভাবে প্রকাশ পেয়েছে। জামসেদপুরে এতো অব্যবস্থার মধ্যেও সত্তর দশকে এদের দল আই এফ এ শিল্ড, ডুরাণ্ড কাপ, রোভার্স কাপ, বরদলুই ট্রফি, স্ট্যাফোর্ড কাপ, নেপালের রাজা মহেন্দ্র গোল্ডকাপ, পাটনার শ্রীকৃষ্ণ গোল্ড কাপ, এলাহাবাদের পাটু মজুমদার শিল্ড প্রভৃতি বহু বড় প্রতিযোগিতায় দল পাঠিয়েছে। কোথাও যৎসামান্য, আবার কোথাও পুরোপুরি সাফল্য পেয়েছে ইস্পাত নগরীর ফুটবলাররা।

এ বছর আন্তঃ টাটা ফুটবল মিটে টেলকো বিজয়ী হয়েছে। সুনীল মুখার্জি, শ্যামল সেনগুপ্ত, সনৎ হাজরা, দিলীপ মণ্ডল, সন্তোষ ভৌমিক দেবাশিস ঘোষ, অনিতোষ কুণ্ডু, রবীন সাহা রায়, সুভাষ মুখার্জি সাম্প্রতিক কালের সেরা ফুটবলার হিসাবে চিহ্নিত। এছাড়াও মিলার রাউথ, বাসুদেব ব্যানার্জি, আখতার, চাঙ্গু লামা, অঞ্জন বড়ুয়া, অজয় সিং, শিবপ্রসাদ সরকার স্থানীয় ফুটবলে উদীয়মান খেলোয়াড়। আখতার নবাগত গোলরক্ষকদের মধ্যে সবচেয়ে সম্ভাবনাপূর্ণ। এরা সবাই জামসেদপুরের সেই সব নমস্য ফুটবলারদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এগিয়ে চলেছেন। এখানে না আছে কোন ভাল কোচ, না আছে উজ্জ্বল ভবিষ্যত, তবুও এদের রণে ক্ষান্ত নেই।

জামসেদপুরে একসময় বহু বিখ্যাত খেলোয়াড় খেলে গেছেন। পি কে ব্যানার্জি, সুনীল ঘোষ, পরেশ চ্যাটার্জি, বুড়ো চক্রবর্তী, গণেশ দাস, ভানু গুহঠাকুরতা, সলিল ধর এখানকার খেলোয়াড়। সুনীল ঘোষ ৫৯ থেকে ৬১ পর্যন্ত মোহনবাগানে খেলেছেন। ৬১ সালে তিনি আফ্রিকা সফর করেন। পরেশ চ্যাটার্জি খেলেছেন ইস্টবেঙ্গলে। এস



আন্তঃ টাটা ফুটবলে বিজয়ী টেলকো দল

জোহা, মহাবীর প্রসাদ, চন্দ্রেশ্বর প্রসাদ, মহঃ সফি, দীপক ব্যানার্জি, আনোয়ার হোসেন এরা সবাই কলকাতায় খেলে সুখ্যাতি কুড়িয়েছেন। এদেরও আগে তাতা রাও, রমজান, সুরাই, গেমিও, ছোটমণি, বড়মণি, গালিব, হাবিব এখানকার বড় খেলোয়াড় ছিলেন। পি কে'র কথা বেশি কিছু বলার প্রয়োজন রাখে না।

প্রতি বছর কলকাতার তিন প্রধান দল এখানে প্রদর্শনী ফুটবল খেলতে আসে। স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে তখন দেখা যায় অভূতপূর্ব উন্মাদনা। কারণ তারা ফুটবল ভালবাসে। কিন্তু জি এস এ কর্মকর্তাদের গাফিলতিতে সে সুযোগ যদি হাতছাড়া হয়ে যায় সেজন্য তাদের জবাবদিহি করতে হবে স্থানীয় ফুটবল প্রেমী জনগণের কাছে।

রেফারিরা আরও দায়িত্বশীল ও নিরপেক্ষ হোন



রেফারিদের ত্রুটিপূর্ণ পক্ষপাতসুলভ খেলা পরিচালনাকে কেন্দ্র করে ময়দানের ফুটবল ঘিরে যে ঘটনা ঘটে চলেছে, তা যেমন অভিনব তেমনি অত্যাশ্চর্য। কিছুদিন আগে লিগের কালিঘাট-পুলিশের খেলায় নির্ধারিত সময়ের পাঁচ মিনিট আগেই বিরতির বাঁশী বেজে গেল। ঘটনাটিতে কৌতুকবোধ হয়েছিল সকলেরই। এরই দিন সাতেক পর একটা ভয়াবহ চাঞ্চল্যকর খবর লিগ ফুটবল সম্বন্ধে আমাদের একেবারে হতাশ করল। গোলে বল না ঢুকিয়েও বিপক্ষ দল যে গোল পেতে পারে তার এক অনন্য নজীর সৃষ্টি করলেন ময়দানেরই এক ফুটবল রেফারি। এই সমস্ত হাস্যকর ঘটনার সাক্ষী হতেই কি প্রতিদিন হাজার হাজার খেলা-পাগল দর্শক মাথায় রোদ-ঝড়-বৃষ্টি আর বুক ফাটা তৃষ্ণা (দুই অর্থেই) নিয়ে হাজিরা দেয় ফুটবল পীঠস্থান এই ময়দানে ?

শুধু তাই নয়, কোন বড় দলের খেলা থাকলেই রেফারিদের স্নায়ুচাপে ও পক্ষপাত দোষে ভুগতে দেখা যায়। বড় দলের বিরুদ্ধে কোন তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিতে তারা যেন কেমন ভয় পান ? সম্প্রতি একটি বড় খেলায় এশিয়াডে প্রতিনিধিত্ব করা একজন ফরোয়ার্ড তার স্বাভাবিক নৈপুন্য দেখাতে বারে বারে ব্যর্থ হলেও প্রতিপক্ষ দলের জনাচারেক ডিফেণ্ডারকে লাথি কষাতে ব্যর্থ হননি। আবার ছোট দলের একজন ফরোয়ার্ড যখন বল নিয়ে বিপক্ষ সীমানায় ঢুকে যান তখন তাকে বাধা দিতে ব্যর্থ হয়ে তার জার্সি টেনে ছিঁড়ে দেন বড় দলটির একজন ডিফেণ্ডার। দুটি ক্ষেত্রেই গ্যালারি ধিক্কার জানালেও রেফারি নীরব থেকে গেলেন, উল্টে সেই ফরোয়ার্ডটিকেই হলুদ কার্ড দেখিয়ে দিলেন, ওই ডিফেণ্ডারের দিকে তেড়ে যাওয়ায়। খেলার একজন নিরপেক্ষ ক্রীড়ানুরাগী দর্শক হিসেবে ব্যাপার দুটিকে নিতান্ত ছোট করে দেখতে পারিনি। আমরা যতই ফুটবল নিয়ে মাতামাতি করি না কেন, এরূপ হাস্যকর ও নিম্নমানের পক্ষপাত-সুলভ খেলা পরিচালনা অচিরেই যে বাংলার ফুটবলের সর্বনাশ ডেকে আনবে এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

একথা ভুললে চলবে না আধুনিক পাওয়ার ফুটবলের সুষ্ঠু ও পরিচ্ছন্ন রূপদানে রেফারিদের দৃঢ় ও নিরপেক্ষ মনোভাব একান্ত প্রয়োজন। বেশ মনে পড়ছে বিশ্বকাপের কোন একটা খেলায় বিপক্ষ পেনাল্টি সীমানায় যখন স্বয়ং ফুটবল সম্রাট পেলে অহেতুক শুয়ে থেকে ছটফট করছিলেন তখন ওই খেলার নামকরা একজন রেফারি, নাম যার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না, সঙ্গে সঙ্গে পেলেকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে 'আপনি যদি অহেতুক এরকম করেন তবে আমি বিরুদ্ধ-ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হব।' রেফারির কাছে নতি স্বীকার করে অগত্যা পেলেকে ভূমিশয্যা ত্যাগ করতে হল। সেই রেফারির এরূপ ব্যক্তিত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য ফিফা দু'দুবার ফাইনাল খেলার পরিচালন-ভার দিয়ে তাকে সম্মানিত করেছিলেন।

তবে অত উঁচুতে না উঠে ময়দানের ফুটবল রেফারিদের কাছে এটুকুই আশা করব, আগামী দিনে তারা সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ এবং উঁচুমানের খেলা পরিচালনার নিদর্শন রাখতে পারবেন।

তপন ভট্টাচার্য, সালকিয়া, হাওড়া।

বাংলার খবরই বেছি লেখা থাকে

খেলার আসর আমায় অনেক দিয়েছে। তবে এই পত্রিকার বিষয়ে আমার মনে কিছু প্রশ্ন জাগরণ হয়েছে। তাই আজ আমি উত্তরের জন্যে আপনার কাছে লিখিতে বাধ্য হয়েছি।

১) খেলার আসরে কেন বাংলার খেলা-ধুলার বিষয়ে বেছি প্রচার করা হয় ? বাংলার বাইরে কি খেলাধুলা হয় না ?

প্রতি সংখ্যায় বাংলার খবরেই বেশি লিখা থাকে তা নয় কি ? অন্য রাজ্যের বা বিদেশের খবর কেন কম প্রচার হয়। প্রচার করলে কি ক্ষতি হয় ?

২) ইস্টবেঙ্গল টিমে দেখা যাচ্ছে ভারতের তরুণ ফুটবল তারকা দ্বারা ভরপুর হয়েছে। তাতে এই টিম আরো শক্তিশালী হওয়া উচিত। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই তারকারা ইস্টবেঙ্গল নামটি রাখতে পারছে না কেন ?

ডারলিং গয়ারী, রামকলবিল গোয়ালপাড়া,
(আসাম)।

(আপনার প্রথম অভিযোগটি কি আদৌ সত্যি ? বাংলা ভাষার কাগজ, তাই স্থানীয় খবর একটু বেশি থাকাটা দোষের কিছু নয়। কিন্তু খেলার আসরই একমাত্র এদেশে খেলার পত্রিকা, যে মাত্র দু' বছরের মধ্যেই সারা ভারতের সব তাজা খবর এমনকি বিদেশেরও খবর পরিবেশন করেছে একটু ভেবে দেখলে ব্যাপারটা আপনি অবশ্যই আর অস্বীকার করতে পারবেন না। —সম্পাদক)

ছোট দল উপেক্ষার নয়

গত ৮ জুন সমর পালের 'মহমেডান স্পোর্টিং ভাল খেলুক' বক্তব্যে উনি যা বলতে চেয়েছেন তাতে সমরবাবুর নির্বুদ্ধিতার পরিচয়ই পাওয়া গেছে। আমার মনে হয় উনি নিজের নামটা ফলাও করে ছাপানোর জন্যই কিছু একটা লিখতে হয় তাই লিখেছেন।

উনি বলেছেন মহমেডান প্রথম খেলায় জিমখানার সঙ্গে ড্র করায় উনি আঘাত পেয়েছেন। মনে রাখা প্রয়োজন, উনি একজন ইস্টবেঙ্গল সমর্থক। যা হোক আমার বক্তব্য নামীদামী খেলোয়াড় নিয়ে তৈরি মহমেডানের বিরুদ্ধে জিমখানা ড্র করায় উৎসাহ, প্রশংসা, সহানুভূতি কার পাওয়া উচিত ?

প্রত্যেক দর্শকই প্রধান প্রধান দলগুলির সমর্থক। তারা বোধহয় ভুলে যান যে এই বড় দলগুলি অধিকাংশ ভাল খেলোয়াড় ছোট দলগুলির কাছ থেকেই পেয়ে থাকে। সুতরাং আমাদের কাছে ছোট দলগুলি মোটেই উপেক্ষার পাত্র নয়। সমরবাবুর জানা উচিত, সব বড়ই অতীতে ছোট ছিল। সুতরাং সব কিছু ভেবে আমাদের ছোট দলগুলিকে উৎসাহিত করা উচিত।

শচীদুলাল বসাক, শ্যামনগর, ২৪ পরগণা।

চুনী গোস্বামী যথার্থ বলেছিলেন

১৮ মে খেলার আসর পত্রিকার 'পাঠকের কলমে' লিয়াকত সরকার, বিলু গঙ্গোপাধ্যায় এবং অন্যান্যদের চিঠি পড়লাম ও প্রখ্যাত প্রাক্তন ফুটবলার চুনী গোস্বামীকে আক্রমণ করার ধরন দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। ওনারা চুনীবাবুকে তৃতীয় শ্রেণীর উগ্র মোহনবাগান সমর্থক, ভবিষ্যৎ বক্তা প্রভৃতি নিকৃষ্ট বিশেষণে ভূষিত করে চুনীবাবুকে উপদেশ দেওয়ার ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। ওদের মধ্যে আবার কয়েকজন স্বীকারও করেছেন ওরা অন্ধ ইস্ট-বেঙ্গল সমর্থক ; অতএব ওদের কাছে সুচিন্তিত অভিমত আশা করা যায় না। ওরা কি ভুলে গেলেন গত দশকে বাংলা তথা ভারতের ফুটবলের উন্নয়নে চুনীবাবুর ভূমিকার কথা। আমরা, বাঙালীরা, চুনীবাবুর নামে গৌরব বোধ করে থাকি।

১৩ এপ্রিলের সংখ্যায় চুনীবাবুর ভবিষ্যৎ-বাণীর সঙ্গে বর্তমান দলীয় অবস্থা মিলিয়ে দেখা যায়। চুনীবাবু লিখেছেন, 'মহমেডানের পক্ষে এবার কোন ওলট-পালট করা আদৌ সম্ভব নয়'—এই মন্তব্যটি জলন্ত ভাবে সত্য হল।

মেঘনাদ কোঙার. শীতলাবাড়ী রোড,
দিনহাটা, কুচবিহার।

ধন্যবাদ

আপনাদের ১৫-৬-৭৯ তারিখের 'খেলার আসর'-এ বর্ষশ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদদের তালিকা প্রকাশের জন্য ধন্যবাদ। এই নির্বাচন-এর মাধ্যমে উপযুক্ত ব্যক্তির প্রতি যোগ্য মর্যাদা প্রদান করে আপনারা পত্রিকার ভাবমূর্তিকে আরও উজ্জল করলেন। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই নির্ভুল নির্বাচন, বিচক্ষণ এবং নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার প্রমাণ।

আশা রইল ভবিষ্যতেও আপনারা কোনো বিশেষ গোষ্ঠী দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে নিরপেক্ষ মতামত দ্বারা পত্রিকাকে আরও হৃদয়গ্রাহী করে তুলবেন।

পূর্ণেন্দু কুমার সরকার, জামসেদপুর।

সুব্রতদার জন্য গর্বিত

১৫ জুন খেলার আসর থেকে জানতে পারলাম যে, ১৯৭৮-এর সেরা খেলোয়াড় কে কে নির্বাচিত হয়েছেন। ফুটবলে সুব্রতদা সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন জেনে আমরা খুব গর্বিত। তাকে আমাদের অন্তরের ভালোবাসা জানালুম।

সুমিত, অমিত ও সুজিত নন্দী, কুম্ভারডুবি,
পটারী।

ছোট ক্লাবগুলির জন্য

কলকাতার অর্থাৎ পশ্চিমবাংলার ফুটবলের উন্নতিকল্পে যারা চিন্তামগ্ন সেইরকম কর্তা ব্যক্তিদের কাছে একটি অনুরোধ জানাই। অগণিত সমর্থকপুষ্ট বড় ক্লাবগুলির লিগের খেলায় যদি টিকিটের দাম ১০ পয়সা বাড়ানো হয় তাহলে বোধহয় দর্শক সংখ্যায় মোটেই ঘাটতি হবে না। এই বাড়তি লাভের পয়সা-টুকু যদি ছোট ক্লাবগুলিকে সাহায্য করা হয় তবে মনে হয় অর্থাভাবে রুগ্ন ক্লাবগুলির প্রভূত উপকার সাধন হবে, এবং তারাও কিছু ভাল প্লেয়ার ধরে রাখতে সক্ষম হবেন এবং খেলা-গুলিও হবে প্রাণবন্ত। হয়ত 'তিন ছাড়া শূন্য' এই অপবাদটুকুও ভবিষ্যতে মুছে যাবে।

মনোজ দাস, সিদগোড়া, জামশেদপুর।

[কলকাতার ঘেরা মাঠের টাকা আই এফ এ-বা ক্লাবগুলি পায় না। ময়দান সরকারের। টিকিট বিক্রির অর্থও সরকার পায়।—সম্পাদক]

ক্লডিয়াসের হাস্যকর মন্তব্য

১৮ মে সংখ্যায় ভারতীয় হকি দলের ম্যানেজার ক্লডিয়াস যে মন্তব্য করেছেন তা খুব হাস্যকর। তিনি বলেছেন, অ্যাসট্রো টার্ফে না খেলার ফলে দলকে অসুবিধায় পড়তে হয়েছে। এইসব যুক্তি দেখিয়ে নিজের সম্মান বাঁচানো যায়, কিন্তু দেশের সম্মান ? ভারতীয় হকিতে আঁধার যে ঘনিয়ে আসছিল এ আশঙ্কা অনেকদিন আগেই দেখা যাচ্ছিল। পার্থে আরেকবার তা প্রমাণিত হল। আন্ত-র্জাতিক হকিতে পরাজিত হয়ে ফিরে বারংবার একই অজুহাত—কখনও মাঠের দোষ, কখনও আবহাওয়ার দোষ দিয়ে ভারতীয় হকিকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিয়েছেন আমাদের দেশের অপদার্থ হকি-কর্মকর্তারা। আন্তর্জাতিক হকিতে প্রতিপক্ষের ধাক্কায় ভারত যতই পিছিয়েছে, ততই স্বদেশের কর্মকর্তারা

হকির শুভাশুভ সম্পর্কে তারা আদৌ চিন্তিত নন।

আজ কর্মকর্তাদের নিকট বিনীত অনুরোধ তারা পারস্পরিক বিরোধ ভুলে ভারতীয় হকিকে অন্ধকার থেকে আলোয় ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করুন। ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে স্কুল কলেজের ছাত্রদের নিয়ে দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করুন।

তারাশঙ্কর চট্টরাজ, নিয়ামতপুর, বর্ধমান।

বাংলায় ধারাবিবরণী

কয়েক বছর আগে যখন খেলার ধারাবিবরণী ইংরাজীতে শুনতাম, তখন মনে মনে প্রশ্ন করতাম 'আমরা বাঙালী, আমাদের মাতৃভাষা বাংলা'। তাহলে বাংলায় ধারা-বিবরণী দেওয়া হয় না কেন? গত কয়েক মরশুম ধরে কলকাতায় প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগ শিল্ড ও অন্যান্য খেলার বাংলায় ধারা-বিবরণী দেওয়া শুরু হয়েছে। আমার মত লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালীর মন গর্বে ভরে উঠলো—

কিন্তু মজার কথা হলো, মামার জোরে এমন অনেক মহাশয়দের ধারাবিবরণী দেওয়ার জন্য সুযোগ করে দেওয়া হয়, সেই সব মহাশয়রা—সত্যিই কি ধারাবিবরণী দেওয়ার উপযুক্ত?

আমার মত হাজার হাজার শ্রোতা একবাক্যে বলবেন— না।

ওই মহাশয়রা কিন্তু অনেক গুণের অধিকারী। মহাশয়দের গুণগুলো আলোচনা করলে বুঝতে কষ্ট হয় না যে:

১। বাংলা ভাষা মহাশয়দের কতটুকু দখলে আছে?

২। রামের সঙ্গে খেলা হলে মধুর কথা বলে বসেন।

৩। মহাশয়দের গলার স্বর অস্পষ্ট।

৪। মহাশয়রা কোন দলের সমর্থক তা বুঝতে মোটেই অসুবিধা হয় না। কারণ গোল হওয়ার মত অবস্থা সৃষ্টি হলে আর গোল হলে তো কথাই নেই। মহাশয়রা এমন চীৎকার শুরু করে দেন যে তাতে শ্রোতাদের বিরক্ত করা ছাড়া আর কি বলব?

৫। লিগের এখনও অনেক খেলা বাকি। তাছাড়া শিল্ডের খেলাও হবে। যেসব মামারা ধারাবিবরণী দেওয়ার জন্য ভাষ্যকারদের নির্বাচিত করেন সেই মামাদের কাছে অনুরোধ রাখছি যে, আগামী দিনের খেলাগুলির জন্য যাতে ন্যায়, নিরপেক্ষ ও প্রকৃত ভাষাজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের নির্বাচিত করে যেন ধারাবিবরণী দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

আব্দুল হক, কুটীর বাগান মিলন সংঘ,
ধুবী নাগাদী, নদীয়া।

॥ ২ ॥

'মহাভরতে' শুনেছি বিদুর নাকি অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে ধারাবিবরণী দিয়ে কৌরব ও পাণ্ডবদের মহাযুদ্ধের আদ্যপ্রান্ত শুনিয়েছিলেন। তাতে বিদুরের কথার ঢংয়ে এমন শক্তি ছিল যে কৌরবরাজ ধৃতরাষ্ট্র কোন কোন সময় হতাশ হয়েছিলেন, আবার কোন কোন সময় ক্রোধে ফেটে পড়েছিলেন। আর প্রচণ্ড ক্রোধেই হয়তো লোহার বর্ম পরে পুত্রহন্তা ভীমকে বক্ষপিষ্ঠ করে মারতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অত্যানুধিকতার ছাপ হয়তো এদেশের তা নাহলে দূর দূরান্তের মানুষ, বিশেষ করে আমাদের মতো মানুষ যারা সুদূর মফঃস্বলে বসে খেলা শোনার জন্য অতি আগ্রহে যখন (রেডিও) বেতারে কান পাতে তখন ঠিক খেলার উত্তেজক মুহূর্তে ধারাভাষ্যকারদের কথা শোনার থেকে উপস্থিত দর্শকদের কোলাহল শুনবে কেন? এর কি কোনই প্রতিকার নেই?

নবকুমার সরকার, বেথুয়াডহরী, নদীয়া।

দলবাজি কি দায়ী নয়?

ভারতের স্পিন বোলিং-এর অন্তিম লগ্ন আসন্ন প্রায়। বিশ্ববিখ্যাত স্পিনার (?) এবং দু/তিনটি অত্যন্ত নিম্নমানের পেস বোলার সমৃদ্ধ ভারতীয় দল 'প্রাচুর্যের গর্বে' স্ফীত নয়, বরঞ্চ আতঙ্কিত। পৃথিবীর মাঝে ভারতীয় ক্রিকেট টিম নিজের ক্ষীণ অস্তিত্বটুকু কোন ক্রমে ধরে রাখার জন্য প্রাণপণ লড়াই চালাচ্ছে; লড়াই চালাচ্ছে তাদের সব গর্ব শেষ পর্যন্ত স্মৃতি না হয়ে যায় তার জন্য। কিন্তু তাহলে হবে কি? ধূসর বার্ধক্যের পশ্চিম দিগন্তে উপনীত চন্দ্র-বেদী-র দেওয়া স্পিনেরও যে বয়স হয়েছে, সেই তারুণ্যের শক্তি তারা পাবে কোথায়? অথচ দেখুন, এমতাবস্থায় পেস বোলিং-এর (ফাস্ট বোলার তো একজনও নেই) উন্নতির প্রতি কি করা হচ্ছে? হায় হতভাগ্য পেস বোলিং। ভারতের নির্বাচক দলের কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্রও নেই। প্রুডেনশিয়াল কাপ খেলার জন্য যে নামের তালিকা তৈরি করলেন, তা থেকে বাদ পড়ল মদন লালের (!) নাম, দাঁড়ান। আরও আছে। বাদ গেল অভিজ্ঞ কিরমানির নামও (এখনও পর্যন্ত যিনি ভারতের শ্রেষ্ঠ উইকেটকিপার এবং ব্যাটিংমানও যার মোটামুটি উঁচু দরের); কিন্তু আশ্চর্যের কথা কি জানেন তো? (সুরিন্দর খান্নাকে বাদ দিলেও) অর্বাচীন ভরত রেড্ডি (যার উইকেটকিপিংকে কখনই টেস্ট ম্যাচের উপযোগী বলা যায় না এবং ব্যাটিং পর্যায়েও যার দৈন্য সুস্পষ্টরূপে প্রকাশমান) কিন্তু দলভুক্ত হলেন। দলভুক্ত হলেন বৃদ্ধ বেদী, চন্দ্রও। এমনভাবে দল নির্বাচন করার ফলেই কি ভারতের একের পর এক শোচনীয় পরাজয়। এখন এইভাবে যদি প্রকৃত খেলার মান উন্নয়নের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার পরিবর্তে অনভিজ্ঞ কিছু খেলোয়াড়কে দলে স্থান দেওয়া যায়, তাহলে কি তাকে দলবাজি বলা কিছু অত্যুক্তি হবে?

গোপা গুহ নিয়োগী, বারাসাত
২৪ পরগণা।

ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান মৈত্রী সমিতি

অবস্থা এখন এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে অবিলম্বে একটি ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান মৈত্রী সমিতি গঠন করা দরকার। না, ঠাট্টা নয়—অনেক দেখে শুনে, ভেবে চিন্তেই এ কথা বলছি। দু' দলের 'ঠাণ্ডা-মাথা' সমর্থকদের মতামত চাই।

বুলবুল ঘোষ, বাটানগর, ২৪ পরগণা।

[সেরা চিঠির জন্য ১১ টাকার গিফট চেক পাবেন তপন ভট্টাচার্য, সালকিয়া]

ভারতীয় বোলিং কি সফল ছিল?

প্রুডেনশিয়াল কাপ ক্রিকেটে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কাছে, নিউজিল্যাণ্ডের কাছে ভারতের হার এমনকি শ্রীলংকার কাছেও (যার সরকারী টেস্ট খেলার স্বীকৃতি নেই) হার আজ সকল ভারতবাসীর মাথা নিচু করে দিয়েছে। বিশ্ব-বাসীর কাছে আজ আমাদের লজ্জার সীমা নেই। কি বড় কি ছোট সকলের কাছেই প্রাপ্য বুঝি প্রহার। শ্রীলংকার কাছে ভারতের হার তো আমাদের কল্পনার বাইরে ছিল। আমাদের মাননীয় অধিনায়ক মহাশয় শ্রীযুক্ত ভেঙ্কটরাঘবন এই ফলের জন্য দোষী করেছেন প্রথমত আম্পায়ারিং এবং দ্বিতীয়ত ব্যাটিং ব্যর্থতাকে। কিন্তু ভারতীয় বোলিং কি সফল ছিল?' যেখানে ব্যাটসম্যানরা ব্যর্থ হয়েও ১৯০ রান করেছে সেখানে বোলাররা পেয়েছে ১৯৪ রানের বিনিময়ে একটি উইকেট। ভারতীয় বোলিং যদি সফল তাহলে শ্রীলংকা পাঁচ উইকেটে ২৩৮ রান তোলে কি করে? আমাদের তো মনে হয় ভারতীয় বোলিং এবং ব্যাটিং দুটোই ব্যর্থ। তাই নিজের দোষ ঢাকতে চাওয়া অধিনায়কের মোটেই উচিত হয়নি। যেখানে ব্যাটিং এবং বোলিং দুটোই ব্যর্থ সেখানে দল জেতার কোন প্রশ্নই আসে না। কিন্তু এর জন্য প্রধানত দায়ী মণ্ডলীকেই দায়ী করবে। কারণ দল নির্বাচনে তারা অনেক খামখেয়ালীপনা দেখিয়েছেন। মাননীয় ভারত সরকার ও মন্ত্রীদের এবং শিক্ষা মন্ত্রককেও আমাদের একান্ত অনুরোধ তারা যেন এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন। কারণ এর সঙ্গে দেশের স্বার্থ এবং সম্মান জড়িত। ভারতীয় ক্রিকেটে নোংরা রাজনীতি আর কতদিন আমরা বরদাস্ত করব? দয়া করে ভারতীয় ক্রিকেটকে অবনতির হাত থেকে বাঁচান।

সদস্যবৃন্দ, ইউথ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন
বাণ্ডামোণ্ডা, সুন্দরগড়, ওড়িশা

ট্যাংরায় বড় মাঠ চাই

ট্যাংরা অঞ্চলের ছেলেরা একটি বড় মাঠের জন্য বহুদিন ধরে ভুগছে। এখানে একটি (গাঙ্গুলি মাঠ) মাঠ আছে। মাঠটি খুব ছোট। আবার মাঠটির মাঝখানে একটি বড় রেলিং খুব বিপজনক হয়ে পড়ে আছে। ফলে এই অঞ্চলের ছেলেদের খেলতে খুব অসুবিধা হয়। তাই রাজ্য সরকারের কাছে অনুরোধ যে, খুব শীঘ্রই যেন রেলিংটি তুলে একটি বড় মাঠ তৈরি করে দেওয়া হয় এবং ট্যাংরা অঞ্চলের ছেলেদের আকাঙ্ক্ষাও পূরণ হয়।

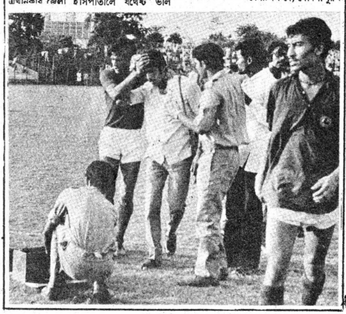
অসীমকুমার কুণ্ডু, ট্যাংরা, কলকাতা-১৫।

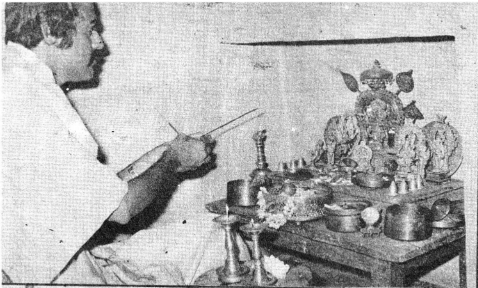
খেলার আঘাত ও চিকিৎসা

এখন সারা পশ্চিমবাংলায় ফুটবলের মরশুম। এটা এমন একটা খেলা, যাতে খেলোয়াড়ের আঘাতের আশংকা প্রচুর থাকে। এই আঘাত অনেক সময় হঠাৎই হয়ে যায়। আবার অনেকক্ষেত্রে বিপক্ষের খেলোয়াড়রা ইচ্ছা করেই করে থাকে। ফলস্বরূপ অনেকের খেলোয়াড় জীবন শেষ হয়ে যায়। কয়েক বছর আগে চোখের সামনে একজন উঠতি স্টপার-এর ফুটবল জীবন শেষ হতে দেখেছি। বিপক্ষ দলের একজন খেলোয়াড় তার হাঁটুর গোড়ায় মেরেছিল। উক্ত স্টপারের বাবা জেলা সহর হাসপাতালে ভাল চাকরি করতেন বলে ছেলেটি ছ'মাসের মধ্যে হাঁটা চলা করতে পারল, কিন্তু ফুটবল খেললেই যন্ত্রণা পেত। এখানকার জেলা হাসপাতালে যথেষ্ট ভাল চিকিৎসা হওয়া সত্ত্বেও ছেলেটি কিন্তু আর প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল খেলতে পারেনি। অনেক জায়গায় এত ভাল হাসপাতাল নেই বা এমন ডাক্তার নেই যারা খেলাধুলার আঘাতের চিকিৎসায় অভিজ্ঞ।

আমার অনুরোধ, আপনারা যদি আপনাদের বহুল প্রচারিত পত্রিকায় খেলার আঘাত ও চিকিৎসা নিয়ে একটি বিভাগ খোলেন, সেটা আপনাদের পত্রিকার সুনামের পক্ষে এবং গ্রামের অনেক খেলোয়াড়ের পক্ষে শুভ হবে। কলকাতায় অনেক ডাক্তার আছেন, যারা এই আঘাতের চিকিৎসায় অভিজ্ঞ। ওদের সাহায্যে সম্ভাব্য আঘাত ও চিকিৎসা বিষয়ে লেখা হলে অনেককে হয়তো অভিমান করে মাঠ ছাড়তে হবে না।

দেবাশিস দে, মেদিনীপুর।







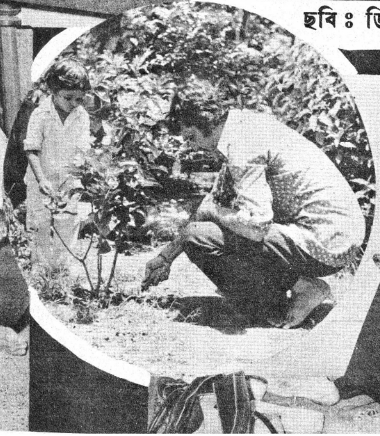


চন্দ্রশেখরের

ক্রিকেটে ম্যাচ জেতায় কে ? অন্যান্য দে
সংক্ষেপে স্পিনাররা। আর স্পিনারদের অন্যতম,
ব্যাটসম্যানের কাছে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে, সেকথা চন্দ্র
এই অভিনব খেলোয়াড়টি বাঙ্গালোরের গৃহকো
ছেলেকে স্কুলে পৌঁছে দেবার সময় হয়ে যায়।
পড়ায়, কিম্বা তার নিজস্ব মিউজিক স্টুডিওতে। চন্দ্র
কখনো কখনো ঠাকুমাও সঙ্গী হন। এছাড়াও আছে

ছবি ঃ ডি জে

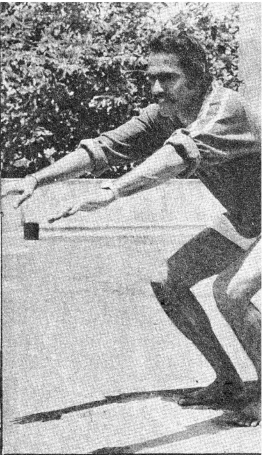












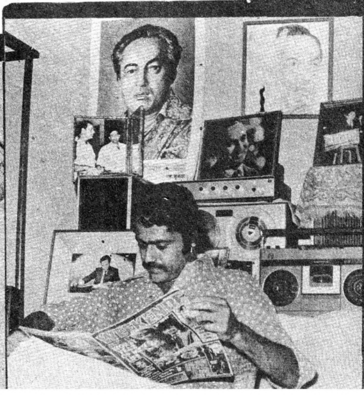
প্রধান সঙ্গী ছেলে নীতিন

। পক্ষে **উত্তরটা** যাই হোক, ভারতের ক্ষেত্রে উত্তর একটাই—বোলাররা ; আরো
করী প্রতিভার অধিকারী ভাগবত চন্দ্রশেখর। তার বল কখন কোন্ অবস্থায়
াধহয় নিজেও জানেন না।

নিতান্তই সাদাসিধে। দিনের শুরু পূজার্চনায়, তারপর একটু ব্যায়াম। ততক্ষণে
ছলে **নীতিন** বাড়িতে প্রায় সারাক্ষণ বাবার সঙ্গী, বাগানে গাছপালার পরিচর্যায়, বই
ানের ভারী ভক্ত—প্রিয় শিল্পী মুকেশ আর সায়গল। পিতা-পুত্রের আলাপে
য়মিত ক্রিকেট কিটের পরিচর্যা আর অগণিত বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে টেলিফোনে আড্ডা।

ানন্দরাজ







ডি সি-র সঙ্গে চলে গেল একটা যুগও

প্রশান্ত ভট্টাচার্য ঃ বছর দশেক আগের কথা। জমজমাটি ফুটবল মরশুম। মেম্বারশিপ কার্ডের লাইন বেশ লম্বা। যথেষ্ট ভিড়। কর্তব্যরত পুলিস ও সার্জেন্ট সেই ভিড় সামলাতে হিমসিম খাচ্ছে। লাইনের মাঝে এক সার্জেন্ট হঠাৎ এক বৃদ্ধকে দেখে পায়ের ধুলো নিলেন। বৃদ্ধ থমকে গেলেন, একটু যেন অপ্রস্তুতভাব। আশপাশের লোকেরাও থতমত। কে এই মানুষটি? সার্জেন্ট পায়ের ধুলো নিচ্ছেন? সার্জেন্ট মাথার টুপিটা খুলে ফেললেন। বৃদ্ধের আর চিনতে অসুবিধে হলো না। একগাল হেসে বললেন, 'আরে রবীন! কেমন আছো। কতদিন দেখিনি তোমায়।' সার্জেন্ট বিনয় করে বললেন, 'মাস্টারমশাই আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে তাই না?' বাধা দিলেন তিনি, 'আরে না, না। কষ্ট আবার কি। খেলার মাঠে কষ্ট বলে কিছু আছে নাকি। দেখছো না কত লোক মাঠে। সবাই খেলা দেখার জন্যে আকুল।' একটু হেসে বললেন, 'তোমার খেলা দেখতেও একদিন এইভাবেই লাইনে দাঁড়িয়েছি।' সার্জেন্ট রবীন মুখার্জি একসময়ে চুটিয়ে পুলিস দলে সেন্টার হাফ খেলেছেন। রবীন লজ্জা পাচ্ছে দেখে মাস্টারমশাই তার পিঠ চাপড়ে বললেন, 'যাও, যাও, ডিউটি করো। বেঁচে থাকো, সুখে থাকো। আমার আনন্দ এই যে তুমি আমারই ছাত্র। বিদ্যাসাগর কলেজের খেলোয়াড়।' সার্জেন্ট রবীন মুখার্জির হয়তো খুব ইচ্ছে ছিল ওই বৃদ্ধ মাস্টারমশাইকে হাত ধরে মাঠে ঢুকিয়ে দেবেন। মাস্টার মশাইয়ের আপত্তি সেইখানেই। মাস্টার মশাই রবীনকে সরিয়ে দিলেন।

আর একদিন টেস্ট খেলোয়াড় পঙ্কজ রায় কি একটা কাজে জোরে গাড়ি ছুটিয়ে চলেছেন। হঠাৎ সেই গাড়ি ব্রেক কষে থেমে গেল। পঙ্কজ রায় নেমে পড়লেন। ফুটপাথ থেকে মাস্টার মশাইকে ধরে নিয়ে এলেন গাড়িতে। পঙ্কজকে দেখে মাস্টারমশাই গদগদ। চোখ ভরে জল গড়িয়ে এল। আনন্দে পঙ্কজকে জড়িয়ে ধরলেন। পঙ্কজ কোন আপত্তিই শুনলেন না। গাড়িতে তুলে তার গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দিলেন। এমন ঘটনা হামেশাই ঘটে। মাস্টারমশাইও সব কাজ ভুলে ছেলেদের সঙ্গে গালগপ্পে মেতে ওঠেন। আর সে শুধু খেলার আর খেলার।

কে এই বৃদ্ধ? মাস্টারমশাই বলতে খেলোয়াড়েরা এত অজ্ঞান কেন? তিরিশ দশক থেকে সত্তর দশক পর্যন্ত যিনি অবাধে



অধ্যাপক দুর্গাচরণ চক্রবর্তী

মাঠে চলাফেরা করতেন, খেলোয়াড়দের কাছে যিনি মাস্টারমশাই। খেলোয়াড় মহলে তিনিই আবার ডি সি। হ্যাঁ, দুর্গাচরণ চক্রবর্তী। বিদ্যাসাগর কলেজের প্রফেসর। বাংলা পড়াতেন। ফিলজফি ও সংস্কৃতেও তিনি এম এ। উঠতি সম্ভাবনাময় খেলোয়াড়দের ধরে এনে কলেজে ঢোকাতেন। ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, সাঁতার কিছুই বাদ দিতেন না। লেখাপড়া ও খেলাধুলো দুটোই চাই। সর্বদাই বলতেন, যে ছেলে খেলাধুলো করে সে কখনও অসৎ হতে পারে না। কোন অন্যায় তার ভেতর থাকতে পারে না। খেলা এবং খেলোয়াড়ের জন্যে তিনি জীবনপাত করতেন।

বাংলার ক্লাস নিচ্ছেন মাস্টার মশাই। রোল কল করছেন। হঠাৎ থমকে গেলেন। গলা অচেনা। প্রক্সিই হবে। কেননা স্বরাজ ঘোষ তো বাইরে খেলতে গেছে ফুটবল। হেসে বললেন, 'ও'রে আমি খুব চিনি। ও যে আমার খেলোয়াড়। পায়ে দারুণ সট।' ছাত্রেরা হতভম্ব।

মাস্টার মশাই বাস থেকে নামতে গিয়ে পড়ে গেলেন। পায়ে দারুণ চোট। কলেজ ছুটি নিলেন। কিন্তু বাড়ি বসে খবর পেলেন বিদ্যাসাগর কলেজ রাঁচিতে ফুটবল খেলতে গেছে বাছাই খেলোয়াড় ছাড়াই। মাস্টার মশাই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কোন রকমে শেয়ালদা স্টেশনে পৌঁছে স্বরাজ ঘোষকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। স্বরাজ ছুটে এল। মাস্টার মশাই আব্দার ধরলেন, তোমাকে আজই রাঁচি রওনা হতে হবে। ট্রফি আমার চাই। স্বরাজ ঘোষ আরও অবাক হলেন মাস্টারমশাইকে সেই রাত্রেই তার সঙ্গে রাঁচি যেতে দেখে। পায়ের ব্যথায় চলতে ফিরতে পারছেন না, তবু যাবেনই। তিনি না গেলে ট্রফি হাতছাড়া হয়ে যাবে। মাস্টারমশাই ছেলেদের নিয়ে ফিরলেন ট্রফি নিয়েই। ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টে ছেলেদের হট্টগোলে নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর অসুস্থতা বেড়ে গেল। চেন টেনে বসলেন। গার্ড সাহেবকে নালিশ জানালেন। মাস্টারমশাই ছুটে গেলেন অহীনবাবুর কাছে। আমার বিদ্যাসাগর কলেজ জিতেছে। একটু আনন্দ করছে এইমাত্র। আপনি এদের ক্ষমা করুন। অহীনবাবু এ কথায় লজ্জা পেলেন।

খেলোয়াড় ছেলেরাই তার ধ্যানজ্ঞান। তাদের জন্যে সুখ ও সুবিধে উজাড় করে দিতে চাইতেন। নিজের ছেলের মতই ভালবাসতেন সবাইকে। তাদের খেলার দক্ষতায় আনন্দে ফেটে পড়তেন। দাপটে সারা ইউনিভার্সিটি মাঠ ছুটে বেড়াতেন। গর্বে ফেটে পড়তেন। বলে বেড়াতেন, আমার ছেলেরা ইউনিভার্সিটি খেলবে, বাংলার হয়ে খেলবে, ভারতের হয়েও খেলবে। সে স্বপ্ন তার বিফল হয়নি। মণ্টু ব্যানার্জি ও পঙ্কজ রায় তার প্রমাণ।

বার্নপুরে বড্ড ঠাণ্ডা। অঘোরে ঘুমোচ্ছে ক্রিকেটার জ্যোতিষ মিত্তির। মাস্টারমশাই চুপিচুপি গিয়ে নিজের কম্বলটা জ্যোতিষের গায়ে চাপা দিয়ে দিলেন।

বাইশ দিনও নেই ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার। মাস্টারমশাই কখানা পড়ার বই হাতে গুঁজে ট্রেনে তুলে দিলেন আমাকে আলিগড়ে রহিমটন বারিয়ার ফাইনাল খেলার জন্যে। 'কদিনে কি আর ক্ষতি হবে। চেষ্টা করে দেখো যদি বোম্বেকে হারাতে পারো।' ক্রিকেটে ওদের হারান শক্ত সেটা ভাল করেই জানতেন।

মাস্টারমশাই আমাদের কাছ থেকে চলে গেলেন গত ৯ই জুন। তার মৃত্যু সংবাদ তার অগণিত ছাত্রের কাছে সময়মত পৌঁছয়নি। কাগজে খবর হয়ে যেদিন এ দুঃসংবাদ আমাদের কাছে পৌঁছল—তখন সব চুকে গেছে। এটা ঠিক, সময়মত কাগজে খবর পেলে মাস্টারমশাইয়ের বেলগাছিয়া বাড়ি ভিড়ে ফেটে পড়ত। তাই আফশোস সকলের। একবার শেষ দেখা দেখতে পেলাম না। মাস্টারমশাই আর ছাত্রের এই মধুর সম্পর্কের নজীর আজ আর খুব একটা দেখতে পাওয়া যায় না। তাই স্কুল-কলেজের খেলাধুলোয় তেমন উৎসাহিত ও সম্ভাবনাময় খেলোয়াড় খুঁজে পেতে কষ্ট হয়। মাস্টারমশাই যেটা একসময় দাবী করেছেন তার কলেজের সাত-আটজন তো ইউনিভার্সিটি খেলবেই। বাদ দেয় কার সাধ্য। মাস্টারমশাই চলে গেলেন। চলে গেল তার যুগও। তার সেই যুগ যখন কয়েকটা রজতখণ্ড নিয়ে শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্ক গড়ে উঠত না। শিষ্যের মধ্যে গুরু নিজের প্রকাশ খুঁজে বেড়াতেন। সেই যুগটাই যেন মাস্টারমশাই-এর সঙ্গে চলে গেল। কিন্তু কি আর করা যাবে।

আমাদের অগণিত খেলোয়াড়ের তরফ থেকে তাকে সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করে তার আত্মার শান্তি হোক এই কামনাই করি।

অনেক ক্রিকেটারের আচরণ অসহ্য—আম্পায়ার টমাস ব্রুকস

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ কোন টেস্ট আম্পায়ার যখন অবসর গ্রহণ করেন বহুক্ষেত্রেই সেটা কোন সংবাদ হয় না। অবশ্য ব্যতিক্রম হয় যখন ওই বিশেষ আম্প্যায়ার বিরক্তি এবং কিছুটা হতাশার মনোভাব নিয়ে খেলা থেকে সরে আসেন। অথবা যদি কোন আম্প্যায়ার এক বিতর্কমূলক পরিস্থিতি মধ্যে দিয়ে খেলা থেকে সরে যেতে বাধ্য হন অথবা তাকে বাধ্য করা হয়। এরপর টেস্ট আম্প্যায়ার বিস্মৃতির অন্তরালে চলে যান চিরকালের জন্য। এই ধরনের দৃষ্টান্ত দেশে বিদেশে ভুরি ভুরি রয়েছে।

কিন্তু এমন ঘটনাও ঘটে দেখা যায় যখন একজন আম্পায়ার তার বিদায় বেলা এক ধরনের ক্রিকেট খেলোয়াড়ের সম্পর্কে বক্রোক্তি করেছেন।

অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস রাজ্যের টমাস ব্রুকস যুদ্ধোত্তর ষোলটি প্রথম শ্রেণীর খেলায় ৬৫টি উইকেট পেয়েছেন এবং মোট ৮৮টি প্রথম খেলায় আম্পায়ারিং করেন। এর মধ্যে ২৪টি টেস্ট ম্যাচ, অস্ট্রেলিয়া—ইংল্যাণ্ডের মধ্যে ১৪টি টেস্ট ওই সংখ্যার মধ্যে।

ব্রুকস ইংল্যাণ্ড দলের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া সফরের সময় (১৯৭৯) দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচের শেষ দিনের মধ্যাহ্ন ভোজের সময় সাংবাদিকদের কাছে তার অবসর গ্রহণের কথা জানান এবং ওই প্রসঙ্গে খেলোয়াড়দের সম্পর্কে এবং সাধারণভাবে সাংবাদিক, টেলিভিশনের ভাষ্যকার এবং ফটোগ্রাফারদের এক হাত নিয়েছেন। ব্রুকস বলেছেন, এমন অনেক খেলোয়াড় খেলার মাঠে এমন সব আচরণ করছেন যা সহ্য করা সম্ভব নয়। বিশেষ করে কোন সিদ্ধান্ত যখন ওদের বিপক্ষে চলে যায়।

টম বলেন, বোলাররা যদি বারবার আবেদন করে তাতে কিছু যায় আসে না। কারণ আম্পায়াররা যেখানে খেলার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত সেখানে ওই ধরনের আবেদন হতে পারে। আম আমার সাধ্যমত এবং সবদিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত দিয়েছি। কিন্তু দেখেছি, এক একটি সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে খেলোয়াড়রা আমার দিকে হিংস্র দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে রয়েছেন। বিড়বিড় করছেন আমাকে উদ্দেশ্য করে; আর তখনই ব্যাপারটা খুব খারাপ লেগেছে। বিশেষ করে আমি যখন নিজের বয়সের কথা চিন্তা করেছি।

তবে টম ব্রুকস একথা স্বীকার করেছেন, সব খেলোয়াড় ওই দোষে দোষী নয়। কিন্তু যে মাঠের মধ্যে আম্পায়ারের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন তাদের ভালোমত শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকা উচিত। এক্ষেত্রে অধিনায়কদের অনেক দায়িত্ব রয়েছে নিজের দলের খেলোয়াড়দের সংযত করার ব্যাপারে। কিন্তু ব্রুকসের অভিজ্ঞতা **হলঃ** অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অধিনায়করা কিছু করেন না। এবং তার বদলে সহ খেলোয়াড়দের সঙ্গে গলা মিলিয়ে একটার পর একটা আবেদন করে যান যা অনেক সময় অহেতুক। অনেক সময় খেলোয়াড়রা এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে আউটের আবেদন করছেন যেখান থেকে ওটা কোন মতেই সম্ভব নয়। বিশেষ করে এল বি ডব্লিউ এর ক্ষেত্রেই এর বাড়াবাড়ি হয়।

রেডিও, টেলিভিশন ভাষ্যকার এবং ক্রিকেট লেখকরা অনেক ক্ষেত্রে এই ধরনের মনোভাব বৃদ্ধির সহায়ক হন তাদের ভাষ্য এবং লেখার মধ্য দিয়ে। একজন ব্যাটসম্যান এল বি ডব্লিউ হয়েছেন কিনা এটা চুলচেরা বিচার সাপেক্ষ। এমনকি বলটির কোন অংশ প্যাডে লেগেছে সেটাও বিচার্যের বিষয়। রান আউট অনেক সময় একটি বির্তকমূলক সিদ্ধান্ত হয়ে দাঁড়ায়। বল স্ট্যাম্পে লাগার মুহূর্তে ব্যাটসম্যানের ব্যাট ঠিক কোথায় অবস্থান করছে এবং যা ঘটছে পলকে। টেস্ট ম্যাচে একটা রান আউট দেওয়া নিয়ে বিতর্কের ঝড় ওঠে। কেন্দ্রীভূত বিতর্কের মধ্যে আম্পায়ারের অবস্থা নিতান্তই অসহায়। আবার টেস্ট ম্যাচের একটি দিন বিনা উৎপাতে অতিবাহিত হলেও নানারকম মন্তব্য ওঠে।

টেলি লেন্সে তোলা একটি ছবি অনেক সময় বিতর্কের সৃষ্টি করে। উঁচুতে স্থাপন করা ক্যামেরার লেন্স আম্পায়ারের পিছন থেকে নেওয়া প্যাডের ওপর বল লাগার ছবিটি বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে। অথচ উঁচু থেকে তোলা ছবিতে বোঝা যাবে না যে বলটি মাটিতে পড়ে কতটা লাফিয়ে উঠেছিল, যাতে আম্পায়ারের চোখে মনে হয়েছে, উইকেটের ওপর রাখা বেল-এর ওপর দিয়ে চলে যাবে।

দুরন্ত গতিতে চলে আসা বল ব্যাটে লেগে প্যাডে লাগল কিনা এটাও স্থির করা নিয়ে তর্ক হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উইকেটকিপার সমেত স্লিপ ফিল্ডাররা আউটের দাবি নিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন। কিন্তু আম্পায়ার দেখেছেন বল ব্যাটের কানায় লেগেছে আগে। আবার স্লিপে ওঠা ক্যাচ নিয়ে বুঝতে ভুল হয় অনেক সময়। বল সুইং করে যাবার সময় ব্যাটের কানায় লেগে গেল কিনা এটা আম্পায়াররা অনেক সময় বুঝতে ভুল করেন। জিওফ বয়কটের ক্ষেত্রে এরকম হওয়ার পর অবশ্য টম ব্রুকস নিজের ভুল স্বীকার করেছেন। আবার এমন হয়েছে বল ব্যাটের কানায় লেগে উইকেট কিপারের হাতে চলে গিয়েছে। কিন্তু বোলার এবং উইকেট কিপার ভাল করে বুঝতে না পেরে অর্ধস্ফুট উক্তি করলেন আউটের জন্য। টম ব্রুকস আউট দিয়েছেন সকলকে অবাক করে। ব্যাটে সত্যিই বল লেগেছিল। ব্যাটসম্যান খালি বুঝতে পেরেছিলেন। এই ঘটনা গ্রাহাম উডকে নিয়ে হয়। উড তখন ৬৪ রান করেছেন। জন লেভার ছিলেন বোলার ও উইকেট কিপার বব টেলার। উড প্যাভিলিয়নে ফিরে গিয়েছে বিনা প্রতিবাদে।

ক্রিকেট খেলায় দু'জন আম্পায়ারের থাবে চারটি চক্ষু, কিন্তু হৃদয় থাকে একটি। যা উত্তেজনা ও আতিশয্যকে দূরে সরিয়ে রেখে একজন বিচারকের দৃষ্টিতে তাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন, এই আশায়।

টম ব্রুকস অবসর গ্রহণ করার সময় জানালেন, তার বয়স হয়েছে ৫৯। ভীমরতি হওয়ার আগে সরে গেলেন ক্রিকেট থেকে। সরে যাওয়ার আগে কিছু সত্যি বললেন কি?

যাঁরা লেখেন, ছবি তোলেন

রচনা বা পাঠকের কলমের চিঠি সব সময় কাগজের এক পিঠে লিখে পাঠাবেন। চিঠিতে বা রচনায় পুরো নাম-ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। ঠিকানা গোপন রেখে চিঠি ছাপতে হলে তা অবশ্যই জানাবেন। অহেতুক ইংরাজি শব্দ ব্যবহার করবেন না। খুব দরকার হলে ইংরাজি কথা বাংলা অক্ষরে লিখুন (যথাঃ ম্যান ইজ মর্টাল)। সব রচনাই সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অকারণে রচনার আকার বাড়াবেন না। ছবিগুলি ভাল না হলে ছাপা সম্ভব নয়। রচনা ও পাঠকের কলমের চিঠির বানানের জন্যে অনুগ্রহপূর্বক 'খেলার আসর'কে অনুসরণ করুন।

—সম্পাদক

এশিয়ান ট্র্যাক অ্যাণ্ড ফিল্ড প্রতিযোগিতায়ঃ দিল্লি থেকে টোকিও ও তারপর......

টোকিও থেকে অরুণ ব্যানার্জি

২৪.৫.৭৯ (বৃহস্পতিবার)

দিল্লি পৌঁছেই ছুটলাম প্যাতিয়ালাতে। সেখানে আমাদের টিম। টিমকে দিল্লি আনতে হবে।

২৫.৫.৭৯ (শুক্রবার)

প্যাতিয়ালা থেকে টিম নিয়ে দিল্লিতে যখন এলাম তখন দুপুর বারোটা। আগে থেকে অ্যাথলিটদের থাকার ব্যবস্থা করতে পারিনি। অগত্যা ঠিকাদারদের কাছ থেকে পাঁচশটা খাটিয়া সংগ্রহ করে ন্যাশনাল স্টেডিয়ামের একটা ঘরে কোন রকমে মাথা গোঁজার ব্যবস্থা করলাম।

ওদিকে চিন্তা আছে ভিসার জন্যে জাপান কনস্যুলেটের অফিসে যেতে হবে। অ্যাথলিটদের কাছে পাশপোর্ট চাইতে দেখি, অনেকের পাশপোর্ট নেই। ভিসা হবে কি করে! মহা ফ্যাসাদ হল। গেলাম ওদের নিয়ে পাশপোর্টের ব্যবস্থা করতে; ব্যবস্থা হলোও। এরপর জাপান কনস্যুলেটের অফিসে ভিসার জন্য আবেদন করলাম।

২৬.৫.৭৯ (শনিবার)

আজ শনিবার। কনস্যুলেট অফিস বন্ধ। পাশপোর্টের যাওবা ব্যবস্থা হল, এখন ভিসা। ভিসা না পেলে তো সব পরিশ্রম পণ্ড হয়ে যাবে।

কর্নেল কৃপাল সিংকে সঙ্গে নিয়ে গেলাম কনস্যুলেটের সঙ্গে দেখা করতে। দেখা করলাম। আমাদের অসুবিধের কথা ভদ্রলোক আগ্রহভরে শুনলেন। কথা শেষ হতে তিনি মাথা নেড়ে বললেন, বারোটার মধ্যে ভিসা পেয়ে যাবেন। পেলামও।

ওখান থেকে ছুটলাম স্টেট ব্যাঙ্কে। বিদেশী মুদ্রা চাই। নাহলে ওরা যাবে কি করে। প্র্যাকটিস করবে না পাশপোর্ট, ভিসা, বিদেশী মুদ্রার জন্যে দৌড়োদৌড়ি করবে। স্টেট ব্যাঙ্কে গিয়ে দেখি সমরেশ বসু রায় আর সুবিমল চৌধুরী কাগজপত্র তৈরি করে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে।

ওখানকার কাজকর্ম সারতে সারতেই সন্ধ্যে ছ'টা বেজে গেল। সোজা ওখান থেকে অশোকা হোটেলে গেলাম। ব্যাঙ্ক আমাকে একটা বিশেষ অনুমতিপত্রও দিয়ে দিয়েছিল যাতে সব অ্যাথলিটদের বিদেশী মুদ্রা আমি একাই সংগ্রহ করতে পারি।

রাত ন'টার সময় বিদেশী মুদ্রা সংগ্রহ করে এলাম ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে। সবাইকে ডাকলাম। হাতে হাতে তুলে দিলাম ওদের প্রাপ্য বিদেশী মুদ্রা।

অভিভূত হয়ে ভারতীয় দলের অধিনায়ক বাহাদুর সিং আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলল: এই প্রথম বাইরে যাবার সময় নিজেরা কিছু না করে ভিসা আর বিদেশী মুদ্রা ঘরে বসেই পেলাম। এর ফলে আমাদের অনুশীলনের যথেষ্ট সময় ছিল। যা কখনও পাইনি।

২৭.৫.৭৯ (রবিবার)

রাত দশটা তিরিশ মিনিট। এয়ার ইণ্ডিয়া, জাপানগামী যাত্রী নিয়ে আকাশে উড়ল। এশিয়ান ট্র্যাক অ্যাণ্ড ফিল্ড কম্পিটিশনে অংশগ্রহণকারী ভারতীয়দের বাইশজন অ্যাথলিট, দুজন কোচ, যুগ্ম ম্যানেজার, কর্নেল কৃপাল সিং আর আমি ছিলাম ওই যাত্রী দলে।

এক সপ্তাহ টানা পরিশ্রমের পর মনে পড়ছিল কয়েকটা দিনের ঝক্কি ঝামেলার কথা। যখন আমাদের যাবার সরকারী অনুমোদন পেলাম, তখন আর সুষ্ঠুভাবে সবকিছুর আয়োজন করে উঠতে পারিনি।

২৮.৫.৭৯ (সোমবার)

এয়ার ইণ্ডিয়ার ঘোষকের কণ্ঠ বেজে উঠল। শুনলাম: এখন বেলা এগারোটা। আমাদের আকাশযান এখন টোকিওর নায়িতা বিমান বন্দরের মাটি স্পর্শ করেছে।

উৎসাহে ডগমগ আমরা আকাশযানের পেট থেকে বেরিয়ে নানারকম স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে শুল্ক বিভাগ পার হয়ে বাইরে এলাম। দেখি অজস্র ছেলেমেয়ে হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাতে লেখা 'WELCOME INDIA' 'WELCOME MILKHA SINGH' দেখে মনে মনে খুশিই হয়েছিলাম। বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে মিলখা সিং এবং ওমরাও সিং এবং টেকনিক্যাল ডেলিগেটস ও ইণ্ডিয়ান টিমের পি আর ও হিসেবে সমরেশ বসু রায় আমাদের সহযাত্রী ছিলেন।



টোকিওয় বিজয় মঞ্চে ডাইনে রীতা সেন

আমরা যখন আমাদের বক্তব্য জাপান ক্রীড়াসংস্থা প্রতিনিধিদের আপ্রাণ বোঝাবার চেষ্টা করছি তখন হঠাৎ দেবদূতের মতো এক সুদর্শন শিখ যুবক এসে আমাদের বক্তব্য ওদের ভাষায় বুঝিয়ে সমস্ত কিছু সহজ করে তুলল। ওর নাম মিস্টার রণধাওয়া। ইণ্ডিয়ান এমব্যাসির সেক্রেটারি।

এরপর ওখান থেকে হোটেল। টানা সাত/আট ঘণ্টার জার্নির পর সকলেই ক্লান্ত। স্নানাহারের জন্যে সকলেই ব্যস্ত। সুসজ্জিত সিমবাসি দাইচি (SHIMBASHI-DAI-ICHI HOTEL) হোটেল আমাদের স্বাগত জানাল। ভাল লাগল। ভুলে গেলাম বিমান বন্দর থেকে হোটেল পর্যন্ত বাস জার্নির কথা। কলকাতার মতই ট্র্যাফিক জ্যাম। যে রাস্তা দু ঘণ্টায় যাওয়া যায় সেখানে পাঁচ ঘণ্টারও বেশী সময় লাগল। বিমান বন্দরে নেজেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন লাউঞ্জ, ওদের আদর আপ্যায়ন আমাদের মুগ্ধ করেছে; আমাদের দেশে এলে এরকম আদর আপ্যায়ন সত্যিই কোন বিদেশী ভাবতে পারে না।

হোটেলে পৌঁছেই ওদের ফটোগ্রাফার আইডেনটিটি কার্ডের জন্যে ফটো তুলল। তখন বিকেল চারটে হবে। লাউঞ্জের ভেতরেই রেস্টুরেন্ট। দশ মিনিটের মধ্যে গরম গরম ভাত আর তরকারী দিয়ে গেল বেয়ারা। উষ্ণ তরকারী, খিদের মুখে অমৃত মনে করে সবাই খেয়ে নিলাম। অন্যসময় হলে কি করতাম জানি না। আমাদের খাওয়া শেষ হতেই সকলের আইডেনটিটি কার্ড আমার হাতে দিয়ে গেল। ক'মিনিট আর হবে আমাদের ছবি তুলেছে। এরই মধ্যে ডেভালপ করে কার্ডে সেঁটে প্লাস্টিকের খামে পুরে দিয়ে গেল; আমাদের অবাক হওয়া ছাড়া আর কিছুই করার নেই।

হোটেলের ফিফথ ফ্লোরে আমাদের জন্যে পনেরোটা ঘর রেডি। সবাইকে ঘরে ঢুকিয়ে স্নান করে ফ্রেশ হতে বললাম।

রাত সাড়ে আটটায় হোটেলের ডাইনিং রুমে সকলে মিলে গেলাম। থরে থরে খাবার সাজানো। মাংস যত রকমের হওয়া সম্ভব তা আছে; মাছ, ভাত, রুটি, চাইনিজ ফ্রায়েড রাইস, নুডলস, ফল, দুধ, কী নেই! যার যত খুশি খেতে পারো কেউ বলবার নেই। খেয়ে দেয়ে সবাই ক্লান্ত শরীরে বিছানায় যেতেই ঘুম..... ঘুম......আর ঘুম!

২৯.৫.৭৯ (মঙ্গলবার)

টেলিফোন আমাকে ঘুম ভাঙাল ভোর পাঁচটায়। কর্নেলের ফোন: দাদা, চা হয়েছে; জলদি এসো।

মুখ হাত ধুয়ে বেরিয়ে দেখি কোচ বিসরা সিং অ্যাথলিটদের নিয়ে তৈরি হচ্ছে অনুশীলনের জন্যে। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্নান সেরে ব্রেকফাস্টের জন্যে ডাইনিং রুমে গেলাম। আজ মিটিং। সব দেশের ম্যানেজাররা নিমন্ত্রিত। সকাল ন'টায় জাপানী প্রতিনিধিরা এই মিটিং ডেকেছেন।

মিটিং-এ পরিচয় পর্ব শেষে আমাদের চিনিয়ে দিল জাপানী প্রতিনিধিরা কে কোন বিভাগের দায়িত্বে আছে। আমরা বিদেশী। অসুবিধে আমাদের হতেই পারে। তার জন্যেই এই ব্যবস্থা। কথাবার্তা সবকিছুই চলছিল দোভাষীর মাধ্যমে।

এরপর আমাদের সবাইকে অনুরোধ করল ওরা বেলা তিনটের সময় আমাদের স্প্রিন্টারদের অনুশীলন ক্ষেত্রে যেন অতি অবশ্যই নিয়ে যাই; কারণ হিসেবে জানলাম স্টার্টারদের সঙ্গে স্প্রিন্টারদের পরিচয় করিয়ে দিতে চায়। জাপানী ভাষায় স্টার্টার স্টার্ট দেবে। স্প্রিন্টাররা না বুঝতে পারলে খুব অসুবিধে হবে। তাই এই পূর্ব পরিচয়।

স্টার্ট দেবার সাধারণ পদ্ধতি হলো:—

ON YOUR MARK—
SET—
FIRE—

মিটিং সেরে বাইরে বেরিয়ে এলাম। ওদের ওখানে দেখলাম ডাইনিং হল, ক্লাব, রেস্টুরেন্ট (নাইট ক্লাব), মিটিং হল সবই আণ্ডারগ্রাউণ্ডে।

টোকিওর এ সময়ে আবহাওয়া অনেকটা কলকাতায় জানুয়ারির শেষ কিংবা ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহের মতো না গরম না বেশী শীত। চমৎকার আবহাওয়া। অ্যাথলেটিক্সএর জন্যে আদর্শ সময়।

আগামী ৫ তারিখ পর্যন্ত অ্যাথলিটরা কিভাবে চলবে সে ব্যাপারে সবার সঙ্গে আলোচনা করে একটা কর্মসূচী তৈরি করলাম।

কর্মসূচীর প্রধান বিষয় আগামী ৩.৬.৭৯ তারিখ পর্যন্ত কেউ কোন কেনাকাটা করতে পারবে না। কেউ আমার অগোচরে বা বিনা অনুমতিতে হোটেলের বাইরে যেতে পারবে না। কারও কোন অসুবিধে হলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাবে, আমি সব সময়ই তাদের সঙ্গে থাকব। আর কোচেদের সঙ্গে আলোচনা করে কার, কখন, কোথায় প্র্যাকটিস করতে যেতে হবে তাও ঠিক করে দিলাম।

৩০.৫.৭৯ (বুধবার)

আজ দুপুরে অ্যাঞ্জেল মেরী খুব চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল। ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছি। হঠাৎ অ্যাঞ্জেল এসে বলল, 'দাদা, জ্বর হয়েছে। গা-হাত-পা ব্যথা। কি করব?'

সঙ্গে সঙ্গে ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলাম। ডাক্তারী পরীক্ষার ফলে অ্যাঞ্জেলের হাতে এল কিছু ট্যাবলেট। ডাক্তার ভরসা দিল ট্যাবলেটগুলো খেয়ে ফেললে আর গায়ে ব্যথা-ফ্যাতা থাকবে না। স্বাভাবিকভাবে মনে মনে আমি অনেকটা সাহস পেলাম। ফিরলাম হোটেলে। নিজের ঘরে বসেছি আবার অ্যাঞ্জেল এল। ওকে দেখেই বললাম, 'কি হলো?' ও বলল, 'আজ না হয় ওষুধ খেয়ে ভাল হয়ে উঠলাম। কিন্তু কাল? কম্পিটিশনের পর ডোপিং টেস্টে যদি আমাকে ডোপিং-এর জন্যে অভিযুক্ত করে—তখন কী করব?' বললাম, 'সে তখন দেখা যাবে। দরকার হলে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন সাবমিট করব।'

অ্যাঞ্জেল বলল: একবার এক অ্যাথলিটকে ঠিক একই কারণে ডোপিং-এর জন্যে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। সেই অ্যাথলিট আমার মতই অসুস্থতার জন্যে কয়েকটা ট্যাব-

লেট খেয়েছিল। ডোপিং-এ অভিযুক্ত হওয়ার পর সে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনও দেখিয়েছিল ; কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি। অগত্যা বললাম ঃ তবে তো খুব চিন্তায় ফেলে দিলে। ঠিক আছে. ঘরে গিয়ে কিছুক্ষণ কমপ্লিট রেস্ট নাও। দেখি কি হয়। খুব বেশী অসুস্থ বোধ করলে আমাকে জানিও।

অ্যাঞ্জেল নিজের ঘরে আমার কথামতো চলে গেল। ভাবছি তখন বলে তো দিলাম, কিন্তু পরে যদি আরো বাড়াবাড়ি হয় ?

যাই হোক ঈশ্বরের অসীম কৃপা, অ্যাঞ্জেলকে কোন ওষুধপত্রই খেতে হয়নি। একটু রাতের দিকে শরীরটা অনেক ঝরঝরে হয়ে গেল। আমি চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে এই ডায়েরি লিখলাম।

আজকের আর একটা ঘটনা কোচদের সেমিনার। বিভিন্ন দেশ থেকে কোচরা এসেছে সেমিনারে যোগ দিতে। হৈ হৈ কাণ্ড। আমাদের বাংলার সুবিমল, অজিত, মৃত্যুঞ্জয়, মোমিন আর অন্যান্য রাজ্যের সিকোয়েরা, টাওডে (মহারাষ্ট্র), সূর্যনারায়ণ, সুরেশ গুজরাটী প্রমুখ সেমিনারে যোগ দেবার জন্যে এখানে এসেছে। এসেই ওরা প্রথমে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। সেদিনই লিডার অব দ্য ডেলিগেশন অর্থাৎ দলপতি চৌধুরী ধরম সিংও (আই জি, হরিয়ানা) এলেন। কোচদের অনুরোধ করলাম আমাদের অ্যাথলিটদের প্র্যাকটিশের জন্যে কোচকে সাহায্য করতে হবে। ওরা রাজি। অ্যাথলিটদের প্রতিযোগিতা চলাকালীন খুবই সুবিধে হয়েছিল।

৩১.৫.৭৯ (বৃহস্পতিবার)

প্রতিযোগিতার আজ উদ্বোধন হল। প্রথমে মার্চ পাস্ট। তাই ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে বেলা বারোটার মধ্যেই অ্যাথলিটদের নিয়ে হাজির হলাম। বিরাট স্টেডিয়াম। লাখ খানেক লোক বসতে পারে। প্রত্যেক দেশের জন্যে স্টেডিয়ামের নিচে বিশ্রাম ঘর। স্টেডিয়ামের বাইরের দিকে 'ওয়ারম আপ' করার ব্যবস্থা আছে। সেখানেও একশ মিটার টার্টান ট্র্যাক (সিনথেটিক) আছে। এই মাঠ সংলগ্ন আরেকটা স্টেডিয়াম আছে। সেখানে বেস বল আর ফুটবল খেলা হয়। মাঠের ভেতরে গ্যালারির নিচে সারবন্দী ছোট ছোট ঘর : এখানে বসে অফিসিয়ালরা ভালভাবে খেলা দেখতে পারে। টার্টান ট্র্যাক সম্বন্ধে অন্যান্য দেশের অ্যাথলিটরা অভিযোগ করল—বড্ড পুরোনো, স্লো হয়ে গেছে।

আমাদের দেশের অ্যাথলিটরা টার্টান ট্র্যাক বস্তুটা কী তা জানে না। আমিও দেখিনি। আমাদের দেশে এরকম ট্র্যাক নেই। তাই অন্যান্য দেশের অ্যাথলিটদের অভিযোগ চুপচাপ শুনেই গেলাম।

জাঁকজমক করে মার্চ পাস্ট হল। তবে একটা ব্যাপার মনকে খারাপ করে দিল। চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী কেউ কারোর পতাকা নিয়ে মার্চ পাস্টে অংশগ্রহণ করেনি। কারণ ? সেই রাজনীতি এবার খেলাধুলোর জগতে প্রবেশ করেছে।

এই প্রতিযোগিতায় আরব দেশের এমন এক জাতি অংশগ্রহণ করেছে যাদের অন্যান্য রাষ্ট্র এখনও স্বীকৃতি দেয়নি। অতএব ওই অস্বীকৃত রাষ্ট্র অচ্ছুৎ। ওদের পতাকা নিয়ে অন্যান্য কয়েকটা দেশ মার্চ পাস্টে অংশগ্রহণ করতে চাইল না। তাই সবদিক রক্ষে করে



এশিয়ান ট্র্যাক অ্যাণ্ড ফিল্ডে বিজয়ী জনৈক পুরস্কার নিচ্ছে। এই স্টেডিয়ামেই '৬৪-তে ওলিম্পিক্স হয়েছিল

পতাকাবিহীন মার্চ পাস্ট অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল।

আজ আমাদের মোট তিনটে ইভেন্ট হল। বেলা চারটের সময় ২০ কিলোমিটার ওয়াক দিয়ে শুরু। চারটে তিরিশে হ্যামার থ্রো আর শেষ ইভেন্ট হল বেলা চারটে পঞ্চাশে—৩০০০ মিঃ স্টিপল চেজ।

শুরুতে ভাগ্যদেবতা বেশী সুপ্রসন্নই ছিল আমাদের উপর। ২০ কিমি ওয়াকে হারকাম সিং প্রথম সোনা আনল। আর তারপর রাঘবীর সিং হ্যামার থ্রো করে ব্রোঞ্জ নিল। গোপাল সাইনির দুর্ভাগ্য। ওর উপর আমাদের অনেক আশা ছিল। কিন্তু কি যে হয়ে গেল। ৩০০০ মিঃ স্টিপল চেজে গোপাল ব্রোঞ্জ আনল। ও প্রথম ল্যাপেই হাঁটুতে আঘাত পেল। দ্বিতীয়বার আঘাত পেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তবু সেই অবস্থায় গোপাল যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের মত শেষ চেষ্টা চালিয়ে একটা ব্রোঞ্জ পদক উদ্ধার করল। পুরস্কারের অঙ্ক গোপালের হিসেবে যেমন বাড়ল—বাড়ল ভারতেরও।

হোটেলে ফিরে নিজেদের ভুল ত্রুটি আর গুণ নিয়ে আলোচনা করতে করতে খাওয়া দাওয়া করে যে যার ঘরে ঘুম লাগাল। আমার এই রাতে যখন সমস্ত জাপানে নিশ্চিত অন্ধকার নেমে এসেছে—অনেকেই রাত্রির বিছানা নিয়েছে আবার অনেকে হোটেল বার রেস্তোরাঁ করে বেড়াচ্ছে ঠিক এখনই ডায়েরী লেখার ফুরসুত। তারপর ঘুম।

১.৬.৭৯ (শুক্রবার)

আজ সারাদিনটাই ব্যস্ততায় কাটল। অনেকগুলো ইভেন্ট ছিল। দুপুর একটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত প্রতিযোগিতা। সবাই একসঙ্গে মাঠে যেতে চায় না। যাদের দেরিতে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার কথা তারা কেউই এত আগে আগের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে যেতে চায় না। ভেবে দেখলাম—ওদের যুক্তি আছে বলার ; কিন্তু হোটেলে ওদের একা রেখে যাওয়া যায় না : ওরা মাঠে একা একা যাবে তাও হয় না। অতএব মিলখা সিং, সুরেশ, মৃত্যুঞ্জয়, সমরেশদের রেখে গেলাম। কাকে কখন মাঠে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে সে ব্যাপারে বন্দোবস্ত করে প্রথম দিকের ইভেন্টে যারা আছে তাদের নিয়ে মাঠে গেলাম।

কমলজিৎ সান্ধু আর বিসরাকে ওয়ার্মিং আপের জায়গায় থাকতে বললাম। কারণ মূল স্টেডিয়ামের ঘোষণা ওয়ার্মিং আপের জায়গায় ঠিকমতো পৌঁছয় না। আমি আর কর্ণেল সবসময় সতর্ক হয়ে থাকলাম যাতে ঠিক সময়ে প্রতিযোগীরা মাঠে হাজির হতে পারে।

টোকিওয় বাংলার কর্মকর্তাদের সঙ্গে মিলখা সিং, রীতা সেন, কমলজিত সান্ধু ও কৃপাল সিং



আজ আমাদের দুর্দিন। একটাও সোনা আসেনি। গীতা জুৎসি যদিও দ্বিতীয় হয়েছিল তবু আগে লেংথ ক্রশ করেছে এই অজুহাতে তাকে বাতিল করা হল। যার সোনা সম্পর্কে একেবারে নিশ্চিত ছিলাম সেই বাহাদুর সিং এবারকার দলের অধিনায়ক, তাকে সোনা পাওয়া তো দূরের কথা ব্রোঞ্জ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল।

মেয়েদের প্রতিযোগিতায় যার উপরে আমাদের খুব ভরসা ছিল সেই রীতা সেন ১২'৬ করে হিটেই আউট হয়ে গেল। শ্রীরূপা চ্যাটার্জি যদিও ১২'৪৫ করে কোয়ালিফায়েড হল কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফাইনালে ১২'৫১ করে সর্বশেষ স্থানটি দখল করল। ননশেথরণ সম্পর্কে আমরা আশান্বিত ছিলাম, কিন্তু সেও ২০০ মিঃ চতুর্থ স্থান অধিকার করল। মেয়েদের লং জাম্পে অ্যাঞ্জেল মেরীর স্থান হল চতুর্থে। একটা ব্রোঞ্জ ছাড়া ভাগ্যদেবী আজ মুখ ফিরিয়ে রাখল। গীতা জুৎসীর ব্যাপারে আমরা দশ ডলার জমা দিয়ে প্রোটেস্ট করলাম। রেফারি ট্র্যাক নিজে কোনরকম সিদ্ধান্ত না নিয়ে জুরি অব অ্যাপিলের কাছে আমাদের প্রতিবাদপত্র পাঠিয়ে দিলেন। সিদ্ধান্ত কবে হয় দেখা যাক।

২.৬.৭৯ (শনিবার).

বিপর্যয়ের ভেতর দিয়ে আজকে আমাদের দিনটা শুরু হল। ননশেথরণ, আদিল সুমারিওয়ালা হিটে কোয়ালিফায়েড হয়েও ফাইনালে যথাক্রমে ১০'৯১ ও ১১'০৩ করে ষষ্ঠ ও সপ্তম স্থান অধিকার করল।

৪০০ মিঃ হার্ডলসে এ্যাঞ্জেল মেরী হিটে কোয়ালিফায়েড হয়ে ফাইনালে ৬২.০৯ করে পঞ্চম স্থান অধিকার করল। শান্তকুমার ৮০০ মিঃ ১.৫০"১ করে তৃতীয় হয়ে আজকে একটা ব্রোঞ্জ ঘরে আনল। ৫০০০ মিঃ দৌড়ে গোপাল সাইনি চমৎকার দৌড়ে জাপানের নাকামুয়া টাকাও'র সঙ্গে একই সময়ে কমপ্লিট করল ; কিন্তু ফটো ফিনিশে গোপাল তৃতীয় স্থান দখল করল ১৩.৫৯"৮ করে। ভিনসেণ্ট এই প্রতিযোগিতায় ১৪.২১"২ করে পঞ্চম স্থান পেল। ৪×১০০ মিঃ রিলে (মেয়েদের) ৪৬.৯৩ করে ব্রোঞ্জ এলো। জ্যাভেলিন থ্রোতে শেঠী আমাদের নিরাশ করে শেষ স্থান পেল।

শরীর ক্লান্ত ; তবু ঘুম আসে না। মন খুব খারাপ।

৩.৬.৭৯ (রবিবার)

রুপো দিয়ে আজ আমাদের দিনের শুরু। যদিও এই ইভেণ্টে সোনা ছিল আমাদের মুঠোয়। সুরেশবাবু লং জাম্পে ৭'৯৪ লাফিয়ে রুপো আনল ; শুরু হল আমাদের দিন। লং জাম্পে জাপান প্রথম আর তৃতীয় স্থান অধিকার করল। মেয়েদের ২০০ মিঃ শ্রীরূপা চ্যাটার্জি হিটে কোয়ালিফায়েড হতে পারল না। ছেলেদের ৪০০ মিঃ দৌড়ে উদয়প্রভু হিটে দ্বিতীয় হয়ে ফাইনালে উঠল। পেয়ারা সিং কোয়ালিফায়েড হল না। উদয়প্রভু ফাইনালে ৪৮'০৪ করে পাঁচ নম্বর জায়গায় ছিটকে পড়ল। দৌড়ল রতন সিং। ১৫০০ মিঃ দৌড়ে ৩'৪৯" ৮ করে প্রথম সোনাটা এনে দিল রতন সিং। ১০,০০০ মিঃ দৌড়ে ভিনসেণ্ট চমৎকার দৌড়েও ২৯'০৬" ৮ করে চতুর্থ স্থান পেল। ১১০ মিঃ হার্ডলসে সতবীর সিং ১৪'৫৩ করে রুপো আনল। ৪×১০০ ছেলেদের রিলেতে তৃতীয় স্থান →

অধিকার করে ভারত আনল ব্রোঞ্জ। আজকের দিনে স্মরণীয় খবর ৪০০ মিঃ মেয়েদের দৌড়ে বাংলার রীতা সেন ৫৪·৯৯ করে দ্বিতীয় হল। আর অনেকদিন পর কমলজিৎ সান্ধুর (৫৬·০৩) ভারতীয় রেকর্ড ভাঙল।

এই এশিয়ান ট্র্যাক অ্যাণ্ড ফিল্ড প্রতিযোগিতা দেখে আর অন্যান্য দেশের প্রতিযোগী ও কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে নিট ফল আমার চোখে যা ধরা পড়ল তা হচ্ছে—ওরা অনেক সুযোগ সুবিধের মধ্যে খেলাধুলো করে; ওদের তুলনায় আমরা আমাদের অ্যাথলিটদের কিছুই দিতে পারি না।

মনে পড়ছে ডি পি আর কোরিয়ার কিম-ওকশনের (KIM-OKSON) কথা। ওই ছোট্ট মেয়ে ১৫০০ মিঃ ও ৩০০০ মিঃ দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানে নিজের নাম খোদাই করল। আমি বিস্মিত, চমৎকৃত। দৌড়ে গেলাম ওকে অভিনন্দন জানাতে। অভিনন্দনের উত্তরে ও খুব বিনীতভাবেই বলল, 'তোমাদের মেয়েরাও তো চমৎকার ফল করছে। আমরা কত রকমের সুযোগ পাই খেলাধুলোর জন্যে; ওরা তো কিছুই পায় না বলতে গেলে। তবু এরই মধ্যে ওরা যেটুকু এগিয়েছে—আমরা হলে সেটুকুও পারতাম না।' কোরিয়ার আর এক স্কুল ছাত্রী চাং-বুং-সুনের (CHUNG-BONG-SOON) মুখেও একই প্রশংসা।

জাপানের কিতা-হিদেকী (KITA-HIDEKI) আর নাকামুরা-তাকাও (NAKAMURA-TAKAO) সোজা-সুজি বলেই বসল: আমাদের জাপান সরকার অ্যাথলিটদের জন্যে সব দায়-দায়িত্ব নেয়। আমাদের ঘর সংসার সরকার দেখে। আমাদের কাজ—আরো ভালো খেলা, রেকর্ড করা, প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে পদক আনা। আর সরকারের কাজ আমাদের সব দায়-দায়িত্ব বহন করা। ব্যস।

টার্টান ট্র্যাকে সত্যিই ভালো ফল করতে পারিনি আমরা। এ কী আমার কম দুঃখের কথা! তবে অন্যান্য দেশের বিশেষজ্ঞের সঙ্গে আলোচনাকালে ওরা বলেছে, 'ভারতবর্ষের অ্যাথলিটরা এই টার্টান ট্র্যাকে অনভিজ্ঞ। টার্টান দৌড়তে গেলে যথেষ্ট ট্রেনিং না থাকলে একেবারেই দৌড়ন সম্ভব না। এর জন্যে পায়ের পেশী সবল করতে হয়। পায়ে ওয়েট ট্রেনিং না করালে কিছুতেই ভালো ফল আশা করা যায় না। আমাদের দেশে টার্টান ট্র্যাক নেই। তবে কী আমরা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় যোগ দেব না? তা হয় নাকি? আমার মতে, যতদিন আমাদের দেশে টার্টান ট্র্যাকের বন্দোবস্ত না হচ্ছে ততদিন আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছতে গেলে অনেক বেশি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা আবশ্যক।

আরেকটা ব্যাপারেও আমাদের অভাব খুব চোখে পড়ল। এক একটা দেশের অ্যাথলিটদের সঙ্গে কত কোচ। সেই তুলনায় আমাদের কোচ নামমাত্র। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে হলে এরপর থেকে ভারতীয় দলের অনেক বেশি কোচ থাকা খুব প্রয়োজন। তাতে খুব ভালো ফল পাওয়া যায়।

এবারকার প্রতিযোগিতায় আমাদের হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে একটি নাম—গীতা জুৎসি। গীতাকে ওরা ডিসকোয়ালিফায়েড করল। অথচ আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী ওকে খারিজ করার যথেষ্ট কোন যুক্তি নেই।

উদ্যোক্তাদের সামগ্রিক খেলাধুলো পরিচালনায় যথেষ্ট উষ্ণ আন্তরিকতার স্পর্শ আমি অনুভব করেছি। ঠিক সময়ে ঠিক প্রতিযোগিতাটি পরিচালনা করা কম কথা নয়। যথেষ্ট উৎসাহ, অধ্যবসায়, একাগ্রতা আর সময় জ্ঞান না থাকলে এ জিনিস হয় না। আপাতদৃষ্টিতে এই প্রতিযোগিতায় আমাদের ফল হতাশ হওয়ার কারণ থাকলেও অ্যাথলেটিক্স বিশেষজ্ঞরা কিন্তু একবারও তা বলেন না। কারণ যে সময় করে হরচাঁদ ৫,০০০ মিঃ ও ১০,০০০ মিঃ-এ সোনা জিতেছিল, তার চেয়েও ভালো সময় করে গোপাল সাইনি আর ভিনসেণ্ট যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে। ভারতীয়রা চারটে বিষয়ে তাদের জাতীয় রেকর্ড ভেঙে এবারে নতুন রেকর্ড করেছে। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় এবারের এশিয়ান ট্র্যাক অ্যাণ্ড ফিল্ডের প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দল সামগ্রিকভাবে অনেক উন্নত স্থানে পৌঁছেছে—এ বিষয়ে দ্বিমত নেই।

মহিলা হকি দলের নির্বাচন

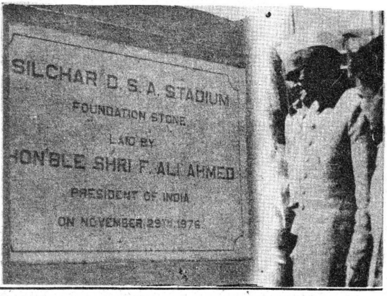
উদয়পুর থেকে মারুফ উল হক: বিশ্বকাপ মহিলা হকি ও প্রি-ওলিম্পিকের জন্য ভারতীয় দলের নির্বাচন হয়ে গেছে। প্রথম আসরটি বসছে ১৬ আগস্ট কানাডার ভ্যানকোভার-এ। সেখানে যোগ দিচ্ছে ভারত-সহ কুড়িটি দেশ—হল্যাণ্ড, পশ্চিম জার্মানি, নিউজিল্যাণ্ড, ওয়েলস, ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, আর্জেণ্টিনা, আয়ারল্যাণ্ড, কানাডা, স্কটল্যাণ্ড, আমেরিকা, জাপান, স্পেন, ভারত, ত্রিনিদাদ, বারমুডা, বাহরীন, ফিজি, হংকং ও জাম্বিয়া।

এই আসরের জন্য ভারতীয় দলে নির্বাচিত হয়েছেন ফিলোমিনা ত্রিনিদাদ, উয়েলমা ডি সিলভা, লরাইন ফারনাণ্ডেজ (বোম্বাই), পুষ্পিন্দর কল, হরপ্রিত গিল (বিশ্ববিদ্যালয়) গঙ্গোত্রী ভাদুড়ি, বর্ষাসোনী এলিসা (রেলওয়েজ), রূপা সোনী (পেপসু), সুধা চৌধুরী, প্রেমমায়া (উত্তরপ্রদেশ), সুদর্শন বাজওয়া (পাঞ্জাব), নাজলীন মাদ্রাজওয়ালা, গীতা সারীন (মহারাষ্ট্র), মধু যাদব (মহাকোশল)।

রূপা, লুনা পুষ্পিন্দর, হরপ্রিত, বর্ষা, এলিসা এবারের দলে স্থান করে নিয়েছে। প্রি-ওলিম্পিকের জন্য স্থান পেয়েছে নির্মল, রেখা, নিশা, সোনিয়া। গত বছরের দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে এবারে স্থান করে নিতে পারেনি আরজিন্দর, মৃদুলা, ইয়োমিনা ও রজনী।

প্রাক-ওলিম্পিকের আসর ১৮ আগস্ট থেকে বসছে মস্কোতে। এই প্রতিযোগিতার জন্য ভারতীয় দলে নির্বাচিত হয়েছেন: মার্গারেট টসকোনস, রেখা মুণ্ডাপান, নীলম শারদ, ভালবিন্দর বাবলা (রেল), লোরেট্টা ডি' সুজা (গোয়া), স্মরণজিৎ, সুরজিত বাজওয়া, নিশা শর্মা (পাঞ্জাব), উষণী, রৌটেলা, হরপ্রিয়া (উত্তরপ্রদেশ), সোনিয়া অ্যালবুকুরেকিউ (বোম্বাই), মীণাক্ষী, নীলু নাগপাল (বিশ্ব-বিদ্যালয়), ওমানা কুমারী (কেরালা), জ্যোতি (দিল্লি), নির্মল কুমারী (পেপসু)।

অনেক প্রত্যাশা নিয়ে গড়ে উঠেছে শিলচর স্টেডিয়াম



রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দীন আলি আহমেদ শিলচর স্টেডিয়ামের শিলান্যাস করছেন / মনোরঞ্জন দে

—**শিলচর থেকে গৌতম দত্ত ঃ** বছর তিনেক আগে ভারতের প্রয়াত রাষ্ট্রপতি ফকরুউদ্দিন আলী আহমেদ যখন শিলচর স্টেডিয়ামের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে এসেছিলেন, তখন বেশ কিছুটা বিস্মিতই হয়ে গিয়েছিলেন এই জেনে যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের খেলাধূলার পথিকৃৎ শিলচরের জন্যে আজো খেলাধূলার সর্বাধুনিক ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। বাস্তবিক পক্ষে কলকাতায় যে সময় ভারতীয়রা সংগঠিতভাবে খেলাধূলা আরম্ভ করেছিলেন, শিলচরেও তার অল্পদিনের মধ্যেই অনুরূপ ভাবে খেলাধূলা আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু ক্রীড়াঙ্গনের সর্বাধুনিক ব্যবস্থা ও পদ্ধতির সঙ্গে শিলচর আজো সম্পূর্ণরূপে পরিচিত হতে পারেনি। এই পিছিয়ে থাকার কারণটা অর্থনৈতিক, কোন সদইচ্ছার অভাব নয়। আর সদইচ্ছার কোন অভাব নেই বলেই শিলচর তথা কাছাড়ের ক্রীড়াঙ্গনের মান উন্নয়নের জন্যে শিলচরে একটি আধুনিক স্টেডিয়াম নির্মাণের প্রচেস্টা চলছে বিগত দুই দশক ধরে শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থা গঠনের পর থেকে।

স্টেডিয়াম নির্মাণের প্রচেস্টা প্রাথমিক ভাবে বাস্তব রূপ নেয় ১৯৬০ সালে রাজ্য সরকার কর্তৃক ২৮ বিঘা জমি দেওয়ার পর। ১৯৬৫ আসামের তৎকালীন রাজ্যপাল বিষ্ণু সহায় স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্যে মাঠটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে ডি এস এ কর্তৃপক্ষকে অর্পণ করেন। শিলচর ডি এস এ কর্তৃপক্ষও যথারীতি একটি স্টেডিয়ামের পরিকল্পনা দেন সরকারের হাতে। কিছু আর্থিক সাহায্যও আসে সরকারের তরফ থেকে। কিন্তু একটি স্টেডিয়াম নির্মাণের পক্ষে ওই টাকা যথেস্ট ছিল না।

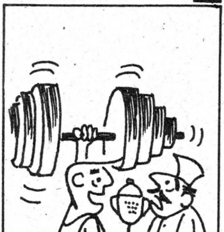
আর্থিক অসংগতির জন্যে এই সময় স্টেডিয়াম নির্মাণের কাজে বেশ কিছুটা মন্থর গতি এসে যায়। কিন্তু এই অবস্থাকে কাটিয়ে উঠে নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করার জন্যে ডি এস এ কর্মকর্তারা 'স্টেডিয়াম কমিটি' নামে একটি সাব-কমিটি গঠন করেন। প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্যে এই সাব-কমিটি প্রচেস্টা চালিয়ে যেতে থাকে।

ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে পঞ্চাশ হাজার, আসাম রাজ্য সরকারের তরফ থেকে ম্যাচিং গ্র্যান্ট হিসেবে আরো পঁচিশ হাজার টাকা, রাজ্য স্পোর্টস কাউন্সিল থেকে পঁচিশ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়। এই টাকা নিয়েই স্টেডিয়াম নির্মাণের প্রস্তুতিও এগিয়ে চলে নতুন উদ্যমে। ১৯৭৬-র ২৯ নভেম্বর তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ফকরউদ্দীন আলী আহমেদ শিলচর স্টেডিয়ামের শিলান্যাস করেন।

প্রস্তাবিত এই স্টেডিয়াম পরিকল্পনাতে আউটডোর ও ইনডোর স্টেডিয়ামের সঙ্গে সুইমিং পুল ও গেস্ট হাউসেরও সংস্থান রাখা হয়েছে। আউটডোর স্টেডিয়ামটি একটি বিশেষ প্যাভিলিয়ন সহ সাতটি ব্লকে আর সি সি গ্যালারি হবে। এর সামগ্রিক দর্শক ধারণ ক্ষমতা হবে প্রায় আটাশ হাজার। সমগ্র আউটডোর স্টেডিয়াম কমপ্লেক্সটি নির্মাণ করতে ব্যয় হবে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা।

ইতিমধ্যে রাজ্য স্পোর্টস কাউন্সিল থেকে আরো পনের হাজার টাকা আসে স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্যে। ইণ্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশনের সুরমা উপত্যকা শাখা এই ব্যাপারে ব্যয় করার জন্যে সাড়ে আটাত্তর হাজার টাকা দান করেছেন। এছাড়া অন্যান্য কয়েকটি ক্ষেত্র থেকেও বেশ কিছু টাকা সংগৃহীত হয়েছে। এই টাকা দিয়ে ইতিমধ্যে প্রথম ব্লকের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। এরজন্যে খরচ হয়েছে তিন লক্ষ তিরানব্বই হাজার টাকা। আর্থিক অভাব ও অত্যধিক সিমেন্ট সংকটের জন্যে এখন গ্যালারির দ্বিতীয় ব্লকের কাজ আরম্ভ করা যাচ্ছে না বলে ডি এস এ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন। তবে নির্মিত ব্লকের নিচে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থার জন্যে আধুনিক পদ্ধতিতে ছটি ঘর নির্মাণের কাজ শীঘ্রই শুরু হচ্ছে।

শিলচর স্টেডিয়ামের কাজ শেষ হয়ে গেলে এ অঞ্চলের ক্রীড়াঙ্গনে এক নতুন যুগের সূচনা হবে। উন্নত পদ্ধতিতে খেলাধূলা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও সম্প্রসারিত হবে। তাছাড়া বড় ধরনের প্রতিযোগিতাও এখানে করা সম্ভবপর হবে। এর সামগ্রিক ফল শুধু দক্ষিণ আসামের জেলাগুলোই ভোগ করবে তা নয়, কাছাড়কে ঘিরে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলো মিজোরাম, ত্রিপুরা, মেঘালয় ও মণিপুরের ক্রীড়াঙ্গনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরাও অনেকাংশে ভোগ করতে পারবেন। এরকম একটি সম্ভাবনাপূর্ণ এবং আশু প্রয়োজনীয় প্রকল্পের কাজ বর্তমানে আর্থিক অনটনে বেশীদূর এগিয়ে যেতে পারছে না। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার যদি ক্রীড়ামানের উন্নয়নে ও তার বিকেন্দ্রীকরণে সত্যি সত্যি আগ্রহী হন, তবে এব্যাপারে তাদের সহযোগিতার হাতকে আরো সম্প্রসারিত করা এখনই দরকার।



কার্টুন ঃ আলি

সব চেয়ে কম দাম



ইউনিট কেনার সেরা মাস—জুলাই মাস

জুলাই মাসে ইউনিটের দাম বিশেষ ক'রে কমানো হয়। এ সময় টাকা খাটালে আপনি বেশী লাভবান হচ্ছেন।

ইউনিট হচ্ছে লাভ ও সুবিধের অপূর্ব সমন্বয়।

১) আপনার পুঁজি সুরক্ষিত থাকছে—ট্রাস্ট আপনার হয়ে ৬০০রও বেশী নামী কোম্পানীর শেয়ার ও ডিবেঞ্চারে টাকা লগ্নী করে।

২) আপনার পুঁজি কখনই আটকে থাকছে না—ইউনিট যে কোন সময় বিক্রী কিংবা ট্রান্সফার করতে পারেন।

৩) আপনি বিশেষ কর-ছাড়ের সবিধে পাচ্ছেন—ইউনিটের ডিভিডেন্ড, ব্যাংক অথবা পোস্ট অফিসের সুদ, শেয়ার ইত্যাদি থেকে আপনার অর্জিত আয় ৩০০০ টাকা পর্যন্ত সাধারণ কর-ছাড়ের আওতায় পড়ছে। এছাড়াও ইউনিটে টাকা রাখলে আপনি বাড়তি ২০০০ টাকা বিশেষ কর-ছাড় পাবেন।

বেশী মুনাফার জন্য ইউনিটে টাকা খাটান। ট্রাস্টের কাছে সকলের উপযোগী নানারকম প্রকল্প রয়েছে।

ক) ইউনিট স্কীম '৬৪ ঃ যা দেয় লোভনীয় ডিভিডেন্ড।

খ) রি-ইন্ভেস্টমেন্ট প্ল্যান ঃ চক্রবৃদ্ধিহারে টাকা বাড়িয়ে তোলার অপূর্ব সুযোগ।

গ) চিল্ড্রেন্স গিফ্ট্ প্ল্যান ঃ একটি বিশেষ বিনিয়োগ যা শিশুর বয়সের সংগে সংগে বেড়ে ওঠে—প্রতি বছর অনেকগুলি নগদ পুরস্কার দেওয়া হয়।

ঘ) ইউনিট লিংক্ড ইন্স্যুরেন্স প্ল্যান ঃ জীবনবীমাসহ ১০ বছরের সঞ্চয় প্রকল্প—বেশী লাভ এবং কর-ছাড়ের সুযোগ।

বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন:

ইউনিট ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া

৪ ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা ৭০০ ০০১
ফোন ঃ ২৩-৯৩৯১, ২৩-১৬৩৮
অথবা আপনার কাছাকাছি ব্যাঙ্ক/পোস্ট অফিস

সঞ্চয় গড়ে তুলুন—ইউনিটে ইউনিটে

Sistas-UTI-104-Bg



মস্কো '৮০ সংবাদ যোগাবে আর যোগাযোগ রাখবে 'কম্পুটার'

অতীন সরকার ঃ ১৯৮০ সালে ২২তম মস্কো ওলিম্পিকের বিভিন্ন প্রতিযোগিতা হবে **১১টি** ছড়ানো স্থানে আর প্রচার মাধ্যমগুলি থাকছে তিনটি প্রধান কেন্দ্রে। এছাড়া আর সাতটি কেন্দ্রে থাকছেন বিশিষ্ট অতিথি ও পরিচালকরা। সর্বোপরি অন্য ২টি বিশেষ স্থানে ওলিম্পিক সংগঠক ও প্রতিযোগীরা থাকছেন। এদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা, বিশেষভাবে প্রতিযোগিতার ফল দ্রুত পৌঁছে দেবার জন্য স্থাপন করা হচ্ছে প্রধান কম্পুটার কেন্দ্র এম সি সি। বস্তুত এই কম্পুটার কেন্দ্র হল—মূল স্নায়ুকেন্দ্র।

প্রতিযোগিতাগুলি হবে—(১) লুঝনিকি লেনিন স্টেডিয়াম, (২) ডায়নামো স্টেডিয়াম, (৩) সেন্ট্রাল আর্মি ক্লাব স্টেডিয়াম, (৪) মাইটিস্কি শ্যুটিং রেঞ্জ, (৫) প্রোস্পেস্টমিরার ইণ্ডোর স্টেডিয়াম (৬) ইসমাইলোভো জিমন্যাসিয়াম, (৭) বিটসা ইকোয়েস্ট্রিয়ান কমপ্লেক্স, (৮) সকোলনিকি স্পোর্টস প্যালেস, (৯) ফ্রাইনাটস্কোয়ে স্পোর্টস কমপ্লেক্স, (১০) ইয়ং পায়োনিয়ার স্টেডিয়াম ও (১১) টালিনের স্পোর্টস সাইট।

প্রতিটি প্রতিযোগিতা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তার ফল যে পাঁচটি কেন্দ্রে পাঠানো হবে সেগুলি হল—(১) ওলিম্পিক টিভি ও রেডিও সেন্টার, (২) প্রধান প্রেস সেন্টার, (৩) ওলিম্পিক গ্রাম, (৪) সংগঠন কমিটির প্রধান কেন্দ্র, (৫) টালিন প্রেস সেন্টার।

আর ওই সব স্থানে ফল পাঠানোর ৩০ সেকেণ্ড পরে সংবাদ (প্রতিযোগিতার ফলসহ) পাঠানো হবে (১) সোভিয়েত স্পোর্টস কমিটি, (২) মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেস সেন্টার, (৩) সাংবাদিকদের হোটেল (৪) ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টার হোটেল, (৫) রেফারিদের হোটেল (৬) সোস্যাল সায়েন্স একাডেমি হোস্টেল, ও (৭) ইয়োথ ক্যাম্পিং সাইট-এ।

কম্পুটার কি করবে ?

আজকের দিনে কোন আন্তর্জাতিক মানের খেলা, বিশেষভাবে ওলিম্পিক প্রতিযোগিতা যন্ত্রগণক বা কম্পুটার ছাড়া চলতে পারে একথা ভাবাই যায় না। কিন্তু মাত্র কয়েক দশক আগে শুধুমাত্র সময় নির্ধারক 'স্টপ ওয়াচ' ছিল একমাত্র যান্ত্রিক উপকরণ। তারপরে হল 'ফটো ফিনিশ' আর তারও পরে 'ইলেকট্রিক স্কোর বোর্ড'।

মাত্র কয়েক বছর আগে স্কোর বোর্ড নিয়ন্ত্রণ ও কয়েকটি বিষয়ের তথ্য সাজানোর জন্য ব্যবহৃত হতো কম্পুটার। ১৯৭২ সালে মিউনিখ ওলিম্পিকে কম্পুটার চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করে এবং প্রতিযোগী ও কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে। মন্ট্রিয়ল ওলিম্পিকে (১৯৭৬) কম্পুটার সরকারী রেকর্ড সরবরাহ করে ও নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দেয়।

১৯৮০ সালে মস্কো ওলিম্পিকে ১২০০০ প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করবেন। আর কয়েক হাজার রেফারি ও সাংবাদিক প্রতিযোগিতা পরিচালনা করবেন বা সংবাদ পাঠাবেন। এদের সাহায্য করবে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য-সম্পন্ন পাঁচটি উপ-বিভাগ সংযুক্ত একটি কম্পুটার ব্যবস্থা।

পঞ্জীন (রেজিস্ট্রেশন) উপ-বিভাগ প্রতিযোগী, রেফারি, কর্মকর্তা ও সাংবাদিকদের সম্পর্কে রেকর্ড রাখবে।

তথ্য উপ-বিভাগে থাকবে—মস্কো, টালিন, কিয়েভ, লেনিনগ্রাদ ও মিনস্ক-এ অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীদের ২১তম ওলিম্পিকের (১৯৭৬) ব্যক্তিগত ভূমিকা, মাপ, পারিবারিক পরিচয় ও শখের বিষয় (হবি)।

ফল উপ-বিভাগ প্রতিযোগিতার রেকর্ড সাজাবে ও ফল প্রকাশ করবে। সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সর্বোত্তম ক্রীড়াশৈলী ও পদকধারীদের বিবরণ দেবে।

প্রতিযোগিতা উপ-বিভাগের আবার থাকবে সাতটি শাখা। এই শাখাগুলি হল—জিমন্যাস্টিক্স, বাস্কেটবল ফেন্সিং, ওয়াটার-পোলো, হ্যাণ্ডবল, সেইলিং এবং ট্র্যাক এণ্ড ফিল্ড।

সংগঠন উপ-বিভাগ অবশ্য এখনই চালু হয়েছে। এই বিভাগ ওলিম্পিকের নির্মাণ কার্যের অগ্রগতির সম্পর্কে খবরা-খবর দিচ্ছে।

মিউনিখ ও মণ্ট্রিয়ল ওলিম্পিকের অভিজ্ঞতা নিয়ে মস্কো ওলিম্পিক কম্পুটার ব্যবস্থা রুশ, ইংরেজী ও ফরাসী ভাষার তথ্য সরবরাহ করবে এবং স্মৃতি ভাণ্ডারে থাকবে আরও বেশী তথ্য। প্রতিটি প্রতিযোগিতার শেষে কম্পুটার সেন্টার চূড়ান্ত ফল সহ পুস্তিকা প্রকাশ করবে।

মস্কোভা নদী তীরে মূল ক্রীড়াকেন্দ্র—লেনিন সেন্ট্রাল স্টেডিয়ামের (লুঝনিকি) পাশে ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় কম্পুটার ভবন তৈরি হয়ে গেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উপলক্ষে হচ্ছে এর 'স্টেজ রিহার্সাল'।



পাদপ্রদীপের আলোয়

হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

বড় হতে গেলে তাকে কত পরিশ্রম করতে হয়, কত সাধনা করতে হয় তা জানেন তিনিই—যিনি সব কিছু ত্যাগ করে লক্ষ্যে পৌঁছান। শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, শিল্পী—কেউই এর বাইরে নন। বাইরে নন খেলোয়াড়রাও। 'পাদপ্রদীপের আলোয়' পর্য্যায়ে আমরা তাদের কথাই ধারাবাহিকভাবে জানাবো যারা খেলাকে ধ্যান-জ্ঞান করে বড় হয়েছেন। জানাবো তাদেরই কথা— যারা ওই তারকাদের এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে জীবনপাত করে চলেছেন।

১৯৬৬ সাল। আই এফ এ শিল্ডের প্রাথমিক রাউণ্ডের একটি খেলা। প্রতিদ্বন্দ্বী উয়াড়ী বনাম চন্দননগর জেলা একাদশ। খেলাটি দুদিন ড্র হয়েছিল। বলা যায়, চন্দননগর উয়াড়ীকে দুদিন ঠেকিয়ে রেখেছিল। অবশেষে তিনদিনের লড়াই শেষে মাথা নত করেছিল চন্দননগর। তবু সবচেয়ে বেশী মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল তাদেরই দলের এক খেলোয়াড়। তিনদিনই তাদের রোগা চেহারার স্টপারটি ছিল দুরন্ত একরোখা। কিছুতেই সে টপকাতে দেবে না বিপক্ষ ফরোয়ার্ডদের। তাই, তিনদিন ফাইট করে চন্দননগরকে শিল্ড থেকে ছিটকে দিলেও উপস্থিত উয়াড়ী কর্মকর্তাদের চোখ কিন্তু আঠার মত আটকে ছিল ওই ছেলেটির দিকে। মনে মনে হিসাব কষে ফেললেন তারা—ছেলেটিকে চাই। অবশ্যই চাই। অতএব উয়াড়ী আমন্ত্রণ জানালো তাকে। সাড়া দিল সে। প্রথম ডিভিসন ফুটবলে তার পদার্পণ ঘটল। উয়াড়ী-চন্দননগর ম্যাচটিই তাকে দাঁড় করালো আলোকিত পথে—সামনে বিছানো রয়েছে একটা নতুন জগত।

অথচ ভাগ্যের পরিহাস একেই বলে, ওই ম্যাচটার আগে ছেলেটির মনে কিন্তু বাসনা ছিল চব্বিশ পরগণা জেলার হয়েই সে আই এফ এ শিল্ডে খেলবে। ট্রায়াল হল। পাশও করল। তবু চব্বিশ পরগণা দলে তার ঠাঁই মিলল না। অজুহাত, সে একটু বেশী রোগা, অর্থাৎ শারীরিকভাবে অনুপযুক্ত। তারপর একজন শুভাকাঙ্ক্ষী ছেলেটির খেলা দেখে চন্দননগরের হয়ে মাঠে নামার ছাড়পত্র পাইয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন ওকে। চব্বিশ পরগণা পরে বুঝতে পারে—তারা নিজেরাই নিজেদের বঞ্চিত করেছে। তবু তখন আর কিছুই করার নেই। যার প্রতি তারা ঔদাসীন্য ও অবহেলা দেখিয়েছে, সে ততক্ষণে হাতছাড়া।

ছেলেটি এর আগে দ্বিতীয় ডিভিসনের বেনেটোলা ক্লাবে খেলত। উয়াড়ী ক্লাবের হয়ে '৬৭-তে আবির্ভাব হল স্বপ্নময় প্রথম ডিভিসন ফুটবলে। ওর জীবনের চাকাটি ঘুরতে আরম্ভ করল।

তার নাম ছেলেটি জানত—কে না জানে? সবাই তার নামের উচ্চারণে শ্রদ্ধায় মাথাটা নামিয়ে আনে। ফুটবলের ওই অসামান্য ব্যক্তিত্বকে সেও শ্রদ্ধা করে—অজান্তে, মনে মনে। তাকে কিন্তু সে এখনও চোখে দেখেনি। শুধু শুনেছে তার সম্পর্কে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম জাগানো অনেক গল্পমালা, যা তাকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করত। তাকে তার দেখতে ইচ্ছে করত। দৃঢ়, ঋজু এবং আপাত কঠোর মানুষটিকে একটু চোখে দেখা।

উয়াড়ীর হয়ে প্রথম ম্যাচ খেলার পরেরদিন সকালে অনুশীলন শেষে সবাই যখন টেণ্টে ক্লান্ত দেহ নিয়ে বিশ্রামরত, ছেলেটি তখনও প্র্যাকটিস করে যাচ্ছে। কোনদিকে হুঁশ নেই তার। বড় হবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাকে সব সময় তাড়িত করে। গরীব ঘরের ছেলে সে। অনেক কষ্ট পেয়েছে, সামনে এখনও বন্ধুর পথ। কলকাতায় এসেছে অনেক আশা নিয়ে—জীর্ণ সংসারে হাসি ফোটাবে। এখানে ব্যর্থ হলে সব শেষ হয়ে যাবে। সে বুঝেছে, সাফল্য পেতে হলে পরিশ্রমের বিকল্প নেই। তাই এখনও প্র্যাকটিসে ব্যস্ত সে।

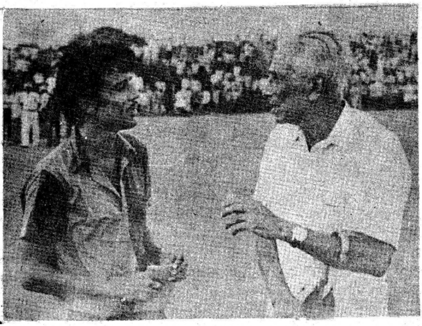
হঠাৎ চমকে ফিরে তাকাল। প্রথমে খেয়াল করেনি। পরে ঘুরে তাকিয়ে সে দেখল—তার কাঁধে হাত রেখে এক বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে, হাতে ছাতা। উত্তেজনায় ছেলেটি থরথর কাঁপছে, চোখ দুটি অপলক, বাক-রহিত। ইনিই তার এবং তার মত অনেক ফুটবলারের স্বপ্নের দেবতা, যাকে সে এই প্রথম দেখছে—কোথায় থাক, কি কর, বাড়িতে কে কে আছে, খাওয়া-দাওয়া কি রকম হয়, সংসারের অবস্থা কেমন, চাকরী-বাকরী কর কি না প্রভৃতি সমস্ত তথ্য পুঙ্খানু-পুঙ্খভাবে জেনে নিয়ে উনি, সেই বাঘা সোম যোগ করে দিলেন,—'তোমার মধ্যে জিনিস আছে, আছে ধৈর্য, অভাব নেই অধ্যাবসায়েরও। একদিন তুমি বড় হবে।' ছেলেটি একেবারে স্থানু, নিস্পন্দ। এ কী শুনছে সে? —আর কার মুখ থেকে? মুহূর্তের মধ্যে তার অন্তরে একটা ভ্রমর নেচে উঠল। কথাগুলো তার মনে নাগাড়ে অনেকক্ষণ গুনগুন করল—'তুমি বড় হবে—বড় হবে—বড় হবে।' এবং এরপর থেকে শুরু হল এক নিরন্তর দীর্ঘ লড়াই—বড় হওয়ার, মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার এবং অসচ্ছলতার অন্ধকার কাটিয়ে পাদপ্রদীপের আলোয় উঠে আসার।

অশোকনগরের এক দরিদ্র পরিবারের ছেলে সে। অভাবই তার বন্ধু। সাধ আর আহ্লাদ সেখানে বিলাসিতা। তাই ছেলেটি সেই বায়নাক্কার মধ্যে যেত না। কিন্তু একটা ব্যাপারে তার প্রবল আসক্তি জন্মে গেল এবং সেটা থেকে সে কখনো বঞ্চিত হত না। —ফুটবল খেলা। সে খেলে এবং খেলে।

যাক্ সে কথা। এই মুহূর্তে ছেলেটি দাঁড়িয়ে কলকাতায়। অশোকনগর থেকে এখানে রেগুলার যাতায়াত করতে হয়। চোস্ত বাঙাল ভাষা বলতে পারে। আর সুন্দর সুন্দর কথা বলে মাতিয়ে রাখতে পারে সবাইকে। কিন্তু অন্তরে ও বাইরে, প্রকৃত পক্ষেই সে এক অমায়িক ও সাদাসিধে ছেলে। ওর যে কোন শত্রুও এটা স্বীকার করে।

ছেলেটিকে বাঘাবাবুর খুব ভালো লেগে গেল। ওর একনিষ্ঠতা মুগ্ধ করল তাকে। তিনি কাছে টেনে নিলেন ওকে। এবং ছেলেটির প্রতি তার প্রথম উপদেশ—'স্টপারে খেলবে না, হাফেই তুমি সবচেয়ে মানান সই হবে এবং এই জায়গায় দাঁড়ালেই তোমার খেলা খুলবে সবচেয়ে বেশী।' অতএব ছেলেটির আর একবার জায়গা পরিবর্তন হল।

তখনও ভাগ্যে চাকরি জোটেনি। উয়াড়ী থেকে পাওয়া সামান্য টাকা তার যাতায়াত নির্বাহে সাহায্য করে। ফুটবলের নমস্য মানুষটি নিশ্চিৎ বুঝতে পারলেন—অশোক-



গুরু বাঘা সোমের সঙ্গে শিষ্য সমরেশ চৌধুরী

নগর থেকে প্রতিদিন যাওয়া-আসা করার ধকল এই রোগা ছেলেটির শরীর সহ্য করতে পারবে না। একদিন কাছে ডাকলেন। বললেন—'তুই কলকাতায় চলে আয়। অতদূর থেকে রেগুলার আসা-যাওয়া তোর শরীরে সইবে না।' সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটির মনে প্রশ্ন জাগল—থাকবো কোথায়? খাবোই বা কি?

সমস্যার সমাধান করলেন গুরু নিজেই—'এখানে মেসে থাকবি। খাবি আমার ওখানে—রোজ দুপুরে ও রাতে। শরীরকে কষ্ট দিয়ে সাধনা হয় না।'

মাথা নত হয়ে এল ছেলেটির। এমন মমতাময় প্রশিক্ষক তো দেখা যায় না!

উয়াড়ীর আর এক খেলোয়াড় চন্দন চৌধুরী থাকতেন এক মেসে। সেখানেই তার সহযোগী হল ছেলেটি। সেটা ৬৮ সাল। নতুন জীবন শুরু হল—বাড়ি থেকে মেসে। ওই বছরই ছেলেটির একটি চাকরি হল এ জি বেঙ্গলে। তার আগে ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের হয়ে খেলেছিল চাকরির জন্য। তবে জুনিয়র ছিল বলে কর্তৃপক্ষ বলেছিল—পরে দেখব। তাই ৬৮-তে বাধ্য হয়ে এ জি বেঙ্গলে ঢুকল ২৩০ টাকার মাইনেয়। ২০০ টাকার মত বাড়িতেই দিতে হত সাংসারিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য। বাকিটা দিয়ে চলত নিজের হাত খরচা। গুরু বলতেন—'যখন টাকার প্রয়োজন হবে, আমার কাছ থেকে চেয়ে নিস্। এতটুকু লজ্জা করবি না—এখানে কেউ লজ্জা করে না।' কৃতজ্ঞতায় ছেলেটির সমস্ত মন-প্রাণ পরিপূর্ণ হয়ে উঠত। কিন্তু তার কাছ থেকে কখনো টাকা নেয়নি।

এরই মধ্যে চন্দন চৌধুরী একদিন মেস ছেড়ে দিলেন। ছেলেটিকেও সাময়িক আশ্রয় থেকে হতে হল বিচ্যুত। এবার কোথায় মাথা গুঁজবে সে?

একটা ব্যবস্থা হয়ে গেল। অশোকনগরের এক পরিচিত ভদ্রলোক থাকতেন ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের পিছনে এক বাড়ির একটি ঘরে। ছেলেটি সাময়িক সেখানেই আস্তানা গাড়ল। ঘরের খাটটি ছিল এত ছোট যে সেখানে দুজন মানুষের পক্ষে ঘুমনো সম্ভব ছিল না। যার ঘর, তিনি নিশ্চয়ই খাট ছেড়ে মেঝেতে শুতে পারেন না। আর তিনি রাজী হলেও ছেলেটি কি সেটা মেনে নিতে পারে? —না। অতএব, মেঝেকেই সে নিজের খাট করে নিল। বাড়ি থেকে আনা চাদর, কম্বল, বালিশ নিয়ে বিশাল কলকাতার এক অচেনা ছোট ঘরের মেঝেতে ছেলেটি নিশ্চিন্তে রাত কাটাতে লাগল। দু'বেলার আহার চলতে লাগল শিয়ালদার কাইজার স্ট্রিটে। একদিনের একটি ঘটনার কথা কখনো সে ভুলবে না।

ছেলেটির শুভাকাঙ্ক্ষী সেই ভদ্রলোক প্রতি শনিবার চলে যেতেন বাড়ি, ফিরতেন সোম-বার। ঘরের চাবিটি তিনি দিয়ে যেতেন ছেলেটির কাছে। সেদিনও শনিবার ছিল। ভদ্রলোক দরজায় তালা লাগিয়ে চাবিটি ভুল-বশত নিজের পকেটেই পুরে রাখলেন। এবং সেই অবস্থাতেই বেরিয়ে পড়লেন তিনি। যখন প্রায় বাড়ি পৌঁছে গেছেন তখনই তার খেয়াল হল—চাবিটি যথাস্থানে রেখে আসা হয়নি। এদিকে ছেলেটিরও মনে ছিল না চাবির কথা।

যথারীতি বাঘা সোমের বাড়িতে রাতের আহার সেরে ছেলেটি পৌঁছলো তার আশ্রয়-স্থলে। দরজায় তালা লাগানো দেখে তার কিছুটা অস্বস্তি হল। শুরু হল অপেক্ষা, ভাবল—হয়তো উনি আজ বাড়ি যাননি,

এখুনি আসবেন। কিন্তু ঘণ্টা দুয়েক কেটে যাবার পরও যখন কেউ এল না, তখন হঠাৎই তার মনে পড়ে গেল ভদ্রলোকের কাছ থেকে চাবি নেওয়ার বিস্মৃতির কথা। এবার তার স্পষ্টতই ভয় করতে লাগল। অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগল সে। রাত তখন প্রায় বারোটা। কলকাতায় ছেলেটি খুব একটা পরিচিতও নয়। গা ছম ছম করতে লাগল তার। কিছুতেই বুঝে উঠতে পারল না এত রাতে সে কি করবে, কোথায় যাবে।

অগত্যা ইষ্টনাম জপ করতে করতে মা দুর্গা বলে ক্লান্ত ও অবসন্ন মনে জনমানব শূন্য রাস্তা ধরে ছেলেটি হাঁটা লাগালো কাইজার স্ট্রিটের দিকে। যখন পৌঁছল, রাত তখন একটা। সমস্ত নিঃঝুম। আস্তে আস্তে কোয়ার্টারের সামনে এসে সে দাঁড়ালো। কলজে ফাটিয়ে গুরুর উদ্দেশে চিৎকার ছুঁড়ল,—'বাঘা দা, ও বা-ঘা দা-আ-আ।'

ঘুম ভেঙে গেল ওনার। কে ডাকে এখন? আলো জ্বালালেন। ঘড়ির দিকে তাকালেন, এ যে একটা বেজে গেছে! এত রাতে কে এল আবার? পায়ে পায়ে জানালার কাছে এগিয়ে এলেন তিনি।

—'কে?' তার জোরালো প্রশ্ন।

—'আমি……'

—'তুই—এত রাতে!! শিগগির আয়, —শিগগির।'

কারোর যাতে ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটে, এমন সন্তর্পণে গুরু নিজের ঘরে নিয়ে এলেন শিষ্যকে। সব কথা ওর মুখে শুনলেন। চোখে মুখে তার উদ্বেগের চিহ্ন ফুটে উঠল। ছেলেটির ক্লান্ত ও অসহায় মুখটির দিকে তাকালেন। ওর জন্য পরম নিশ্চিন্তের আশ্রয় করে দিলেন আগে, দ্রুত ব্যবস্থাপনায়। শোওয়া মাত্রই ছেলেটিকে আচ্ছন্ন করল গভীর ঘুমের প্রশান্তি। অপলক তার দিকে তাকিয়ে রইলেন বাঘা সোম—ফুটবলারদের পিতা। তারপর তিনি নিজের বিছানায় গেলেন।

ছেলেটিকে আস্তানার জন্য একবার মেস আর একবার ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের পিছনে ঘুরতে হত না, যদি তার 'শিক্ষকের' বাড়িতে স্থান সংকুলান হত।

সাধনা চলতে লাগল। বাঘা সোম যেখানে, শিষ্যও সেখানে। বিকালে তিনি বেড়াতে বের হন, সঙ্গে সে। সকালেও তাই। ছাতাটি হাতে নিয়ে সব সময় শিষ্য তার সঙ্গে সঙ্গে থাকত। বাঘাবাবুর বাড়িতে ছেলেটির দুবেলার আহার বাঁধা ছিলই, আবার এমন অনেকদিন গেছে—টেণ্টেও উনি খাবার নিয়ে আসতেন। সবাই যখন চলে যেত, তখন স্পেশ্যাল মাছ, কখনো মাংস কিংবা আপেল টিফিন ক্যারিয়ার থেকে তুলে এগিয়ে ধরতেন ওর দিকে—নে, খেয়ে নে। সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকত ছেলেটি। তিনি ওকে বসে থেকে সব খাওয়াতেন। এইখানেই বাঘা সোম সকলের চেয়ে আলাদা। মর্মে মর্মে তিনি অনুভব করতেন—না খেতে পেলে ছেলেরা খেলতেও পারবে না। তাই তিনি ছাত্রদের কাছে অবশ্যই খোঁজ নিতেন, ওদের খাওয়া-দাওয়া কি রকম হয়। যদি জোটে, তাহলে বেশ। কিন্তু যদি না জোটে? সেখানেই বাঘাবাবু হাজির হন তার আসল চেহারা নিয়ে। এত দরদ, এত মমতা, এত স্নেহ এবং এত ভালোবাসা দিয়ে সম্ভবত আর কেউই ফুটবলারদের সিঞ্চিত করতে পারেননি ভারতীয় ফুটবলের পিতা স্যার দুঃখীরাম মজুমদারের পরে।

সময় এগোবার সঙ্গে সঙ্গে এরই মধ্যে ছেলেটি নিজেকে যথেষ্ট প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন হিসাবে প্রতিপন্ন করে ফেলেছে। এমন সময় এরিয়ান ছেলেটিকে অফার দিল। দুজন কর্মকর্তা সোজা অশোকনগরে হাজির হয়ে ওর বাবা-মা'র কাছে সহজ প্রস্তাব দিলেন,—'আপনাদের ছেলেকে আমাদের দিন। দু'হাজার টাকা দেব।'

বিনাবাক্যব্যয়ে বাবা-মা রাজী হয়ে গেলেন। তাদের কাছে দু'হাজার টাকা যে অনেক! একসঙ্গে এত টাকা তারা আগে কখনো দেখেননি। সংসারে টাকার প্রয়োজনও রয়েছে, অনেক উপকারে লাগবে এই দু'হাজার টাকা। তারা কথা দিয়ে দিলেন। বাবা-মা কথা দিয়েছেন, তাও আবার এরিয়ান ক্লাবে। অতএব ছেলেটি প্রথমে রাজী হয়ে গেল মনে মনে।

কিন্তু হলে হবে কি? তার মনটা সব সময় একটা অস্থিরতা আর যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল। কিছুতেই সে স্থির থাকতে পারছে না। একবার ভাবে যাবো। আবার ভাবে, যাবো না। এই মুহূর্তে চিন্তা করল, এরিয়ানই ভালো। পরমুহূর্তেই চিন্তাধারা পাল্টে গেল, উয়াড়ি না ছাড়াই উচিত। কি করবে সে? উয়াড়ি ছাড়া কি ঠিক হবে? এদিকে দলবদলের শুরুর দিনও এগিয়ে আসতে লাগল ধীরে ধীরে গুটিগুটি পায়ে।

আর সে পারছেনা। কে ওকে পারেন এই দোদুল্যমান অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে? একজন, হ্যাঁ একজনই পারেন। কাইজার স্ট্রিটে ছুটে এল সে। গুরুর কাছে খুলে বলল সব কথা। মন দিয়ে শুনলেন বাঘা সোম। চোখ বন্ধ করে ভাবলেন কিছুক্ষণ, চিন্তা করলেন গভীরভাবে। অতঃপর তার মুখ দিয়ে কথা বেরোলো—'না, এরিয়ানে তুই যাবি না।'

মাথা চুলকে, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত স্বরে আস্তে আস্তে সে বলার চেষ্টা করল,—'না, মানে, এরিয়ান ভালো টিম—খেললে বেটার চান্স……'।

কথা শেষ হতে না হতেই তার সেই দৃঢ় প্রত্যয় মাখা গম্ভীর গলা আওয়াজ করে উঠল। এরিয়ানে যাবার মনোবাসনাকে নাকচ করে দিয়ে তিনি বললেন,—'কেন যাবি? ভালো খেললে কি উয়াড়ি থেকেই বড় টিমে যাওয়া যায় না? জংলা যায় নি? নাম করেনি? আরে শোন, ভালো খেলার কোন মার নেই রে! আর এরিয়ানে একটা ম্যাচ বাজে খেললে তোকে যখন বসিয়ে দেবে? তখন কিন্তু আবার উঠে দাঁড়ানো মুশকিল হবে।'

—'আপনার আদেশই শিরোধার্য। আমি উয়াড়ির হয়েই খেলব।'

ফ্রি কিক করা, নিখুঁত থ্রু বাড়ানো, বল রিসিভিং, পাসিং প্রভৃতি গুণগুলোকে আয়ত্ত করার জন্য একাগ্র সাধনায় সে মেতে উঠল, গুরু মাতিয়ে তুললেন। দেখতে দেখতে চলে এল ৭০ সাল। এর মধ্যে দু'প্রধানেরই দৃষ্টি পড়েছে ছেলেটির উপর। মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল দু'দলের কর্মকর্তারাই ওর কাছে প্রস্তাব পাঠালেন। কি করবে ছেলেটি এবার? এ যে বিরাট সমস্যা, একই সঙ্গে দু'তাঁবুর নিমন্ত্রণ। কারটা সে গ্রহণ করবে? ফেলবেই বা কারটা?

প্রথমদিকে ওর মন যে কোন কারণেই হোক কিছুটা মোহনবাগানের দিকেই ঢলে ছিল। কিন্তু হলে হবে কি, আবার সেই একই অস্থিরতা, ছটফটানির শিকার হল সে। কাকে প্রত্যাখ্যান করবে, কিছুতেই ঠিক করে উঠতে পারছিল না।

চোখের সামনে ভেসে উঠল একটি মুখ। আবার ছুটে এল কাইজার স্ট্রিটে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এটা। বেশ কিছু সময় তাই তিনি চিন্তায় ডুবে থাকলেন। তারপর সংক্ষেপে বললেন,—'তুই ইস্টবেঙ্গলে যাবি।'

১৪ বছর আগে উয়াড়ি-চন্দননগর খেলায় যে ছেলেটির চলার সূচনা, পরবর্তী বছর-গুলোতে অনেক বিচিত্র পথ পার হয়ে, কণ্টকাকীর্ণ রাস্তা পেরিয়ে তিনি পরিণত হলেন এমন একজনে, গত কয়েকবছর ধরে যিনি হাজার হাজার সমর্থকের মুখে উচ্চারিত একটি প্রিয় নাম—সমরেশ চৌধুরী, যাকে সবাই ছোট করে ডাকে 'পিণ্টু'।



এখন কি করছেন

সমীর ঘোষ ঃ ১৯৫৮ সালে জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতার মেয়েদের ২০০ মিটার ফ্রি-স্টাইলের চূড়ান্ত পর্বের প্রতিযোগিতা চলছে। অন্তিম পর্বের কিছু আগেও দেখা গেল ১৪ বছরের একটানা চ্যাম্পিয়ন ডলি নাজির চলেছেন তার লক্ষ্য পথে। তাকে অনুসরণ করছেন সন্ধ্যা চন্দ্র ও ফেনি মিস্ত্রি। সম্ভাব্য বিজয়ী ডলি ও সন্ধ্যাকে উৎসাহিত করছেন উপস্থিত দর্শকমণ্ডলী। কিন্তু সবার অলক্ষ্যে পনের ষোল বছরের একটি মেয়ে ঝড়ের গতিতে তিন জনকে অতিক্রম করে একেবারে শেষ মুহূর্তে বিজয়ীর মুকুটটি ছিনিয়ে নেন। এই মেয়েটিই কল্যাণী বসু। এই প্রতিযোগিতার ৪০০ ও ১০০ মিটার ফ্রি-স্টাইলের বিজয়ীর শিরোপাটিও তার মাথায় শোভা পেয়েছিল।

সাঁতারের শুরু ১৯৫১ সালে বিমলদের তত্ত্বাবধানে, লেকে। থাকতেন কালিঘাট অঞ্চলে। ১৯৫৪ সালে ন্যাশনাল সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যা হবার পর দিলীপ মিত্র ও সুশীল ঘোষের কোচিংও তাকে এগিয়ে যেতে অনেক সাহায্য করেছিল। প্রতিযোগিতা-মূলক আসরে আত্মপ্রকাশ করেন ১৯৫৩ সালে। ক্যালকাটা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত ১ মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতায়, লেকে। সেই বছরই বালী ব্রীজ থেকে আহিরিটোলা ঘাট পর্যন্ত ৮ মাইল প্রতি-যোগিতাতেও অংশগ্রহণ করেছিলেন।

১৯৫৫ সালে প্রথম রাজ্য দলে নির্বাচিত



কল্যাণী ব্যানার্জি

হন। সেবারে জাতীয় প্রতিযোগিতার আসর বসেছিল কলকাতায় ন্যাশনালের পুলে। ১৯৫৬ সালে রাজ্যদল নির্বাচনের ট্রায়ালে ৪০০ মিটার ফ্রি-স্টাইলে ভারতী সাহাকে হারান; সেবার জাতীয় প্রতিযোগিতার আসর বসেছিল বাঙ্গালোরে। বাংলার যে রিলে দলটি প্রথম স্থান অধিকার করেছিল কল্যাণী ছিলেন সেই দলের অন্যতমা সদস্যা। ১৯৫৫ ও '৫৬ এই দুই বছরই ৪০০ মিটার ফ্রি-স্টাইলে তার স্থান ছিল তৃতীয়।

১৯৫৯ সালে বোম্বাইয়ে জাতীয় প্রতি-যোগিতায় ২০০ ও ৪০০ মিটার ফ্রি-স্টাইলে প্রথম স্থান পেলেও ১০০ ও ২০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোকে তার স্থান ছিল দ্বিতীয়। ১৯৬০ সালে কলকাতায় জাতীয় প্রতিযোগিতায় ২০০ মিটার ফ্রি-স্টাইলে ডলি নাজিরের রেকর্ড ভাঙেন। সময় ছিল ৩ মিঃ ০·৫ সেঃ। ১৯৬১ সালে দিল্লিতে ৪০০ মিটারে রেকর্ড সময় করে একটি নজীর সৃষ্টি করেছিলেন। এছাড়া আন্তঃকলেজ ও আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছেন কৃতিত্বের সঙ্গে। ১৯৬৪ সালে সাঁতার থেকে সম্পূর্ণ-ভাবে নিজেকে সরিয়ে নেন ডাক্তারি পড়ার জন্য।

সাঁতার নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও ১৯৬১ ও '৬২ এই দুই বছর রাইফেল হাতেও তাকে দেখা গেছে সাউথ ক্যালকাটা স্যুটিং রেঞ্জে। এই দুই বছর সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় প্রোনে তৃতীয় স্থানও পেয়েছিলেন। নেহাতই ব্যয়বহুল বলে রাইফেলটিকে সযত্নে তুলে রাখতে হয়েছিল।

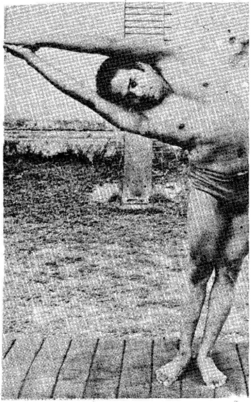
তখনকার কল্যাণী বসু এখন কল্যাণী ব্যানার্জি (এম এস)। জল, সাঁতার ইত্যাদি ব্যাপারগুলি এখন তাকে মোটেই আকৃষ্ট করে না। কর্মস্থল ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ, পার্ক সার্কাস। যদি সুযোগ পান তাহলে স্পোর্টস মেডিসিনে যেতে তিনি আগ্রহী।

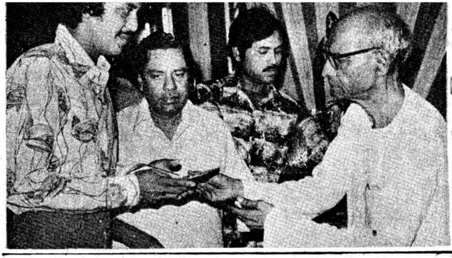
অর্ধচন্দ্রাসন

(পাশাপাশিভাবে)

মনতোষ চৌধুরী ঃ করার পদ্ধতি ঃ প্রথমে পায়ের গোড়ালি দুটো জোড়া করে সোজাভাবে মাটিতে দাঁড়ান। এ সময় লক্ষ্য রাখবেন যেন ডান পায়ের বুড়ো আঙুল ও বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলের মধ্যে ৬ ইঞ্চির মত ফাঁক থাকে। এবার হাত দুটো শরীরের দু পাশ দিয়ে মাথার উপর তুলে নমস্কারের ভঙ্গিতে রাখুন। এ সময় লক্ষ্য রাখবেন যেন হাত দুটো কান ও মাথার সঙ্গে চেপে থাকে এবং হাতের কনুই দুটো টান টান ভাবে সোজা থাকে। এবার কোমর থেকে শরীরের উপরের অংশ ধীরে ধীরে পাশাপাশিভাবে ভেঙে প্রথমে ডান দিকে যথাসম্ভব হেলিয়ে রাখুন। আশা-করি ছবি দেখলেই বুঝতে পারবেন। এ সময় লক্ষ্য রাখবেন যেন হাত দুটো সোজা থাকে। পায়ের গোড়ালি যেন মাটি থেকে উঠে না যায় এবং পা সোজা থাকে। কোমর থেকে শরীরের উপরের অংশ যেন সামনে অথবা পিছনে ঝুঁকে না থাকে। এভাবে প্রথমে ডান দিকে ৩০ সেকেণ্ড এ আসনটি অভ্যাস করার পর আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বাঁ দিকে ঠিক ওইভাবে ৩০ সেকেণ্ড এ আসনটি অভ্যাস করবেন। উভয়দিকে অভ্যাস করার পর অতি অবশ্যই ৩০ সেকেণ্ড শবাসন করবেন। এ আসনটি অভ্যাসের সময় দম স্বাভাবিক রাখবেন। মহিলা এবং পুরুষ উভয়েই এ আসনটি অভ্যাস করতে পারবেন।

উপকারিতা ঃ আসনটি নিয়মিত অভ্যাস করলে কিডনিতে রক্ত চলাচল খুব ভাল হয়। ফলে কিডনির অসুস্থতার জন্য কোন রোগ হতে পারে না। লিভার ও প্লীহা রোগের দ্বারা বড় হয়ে গেলে এ আসন অভ্যাসে সুস্থ ও স্বাভাবিক করে তোলে। মেরুদণ্ডকে সুস্থ ও নমনীয় রাখে। তাছাড়া যাদের কোমরের দু পাশে অতিরিক্ত চর্বি থাকে, তারা এ আসন অভ্যাসে সে চর্বি দূর করতে সক্ষম হবেন। অনেক সময় চলাফেরার দোষে, বসার দোষে এবং শোবার দোষে অনেকের মেরুদণ্ড ডানদিকে কিংবা বাঁদিকে বেঁকে যায়। সে ক্ষেত্রে এ আসনটি নিয়মিত কিছুদিন অভ্যাস করলে মেরুদণ্ডের সেই বক্রভাব দূর হয়ে যায়।





ইস্টবেঙ্গলের অলোক ভট্টাচার্য সিনিয়র লিগ ও নকআউটে সবচেয়ে বেশী উইকেট পেয়েছেন

ক্রিকেটে মফঃস্বল ছেলেরা অবশেষে স্বীকৃতি পেল

বিশেষ প্রতিনিধি ঃ এক গাদা কাপ, ডিস, শিল্ড ও আরও অনেক স্মারক পুরস্কারে সাজানো টেবিলের সামনে বসেছিলেন পশ্চিম বাংলার ক্রীড়ামোদী পূর্ত্ত ও গৃহমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী। ডাঃ বি সি রায় ক্লাব হাউসে বসে শনিবার, ৩০ জুন বাংলার ক্রিকেটের পুরস্কার বণ্টন সভায় তিনি সকলের মনের কথাটি উচ্চারণ করলেন। বাংলা থেকে টেস্ট খেলোয়াড় কেন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না কবছর ধরে? আগামী ১৯ আগস্ট ইনডোর ক্রিকেট পিচের উদ্বোধন হবে একথা জানিয়ে শ্রীচক্রবর্তী বললেন, আড়াই মাসের ক্রিকেট মরশুমকে সারা বছরের জন্য পাওয়া যাবে এবার থেকে। আশা প্রকাশ করলেন যে, বাংলা দেশের ক্রিকেটাররা তার সুযোগ গ্রহণ করবে। তিনি আরও জানান যে, স্বর্গত পংকজ গুপ্তের মূর্তি ওইদিন উন্মোচন করবেন মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রীচক্রবর্তী ক্রিকেট প্রসঙ্গে আরও বললেন, শান্ত মেজাজ ছাড়া ভাল খেলা সম্ভব নয়। সুস্থ পরিবেশেই একমাত্র ভাল খেলা হয় এবং খেলোয়াড় তৈরী হয়।

শনিবারে সি এ বি আয়োজিত পুরস্কার বণ্টন সভায় দলীয় সমর্থকরা শুধু নিজের দলকে বাহবা দিয়েছেন, ক্রিকেটের সুস্থ পরিবেশের পক্ষে যা বিশেষভাবে পরিপন্থী।

পুরস্কার বণ্টন সভায় এবারের নুতুন সংযোজন জেলার শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটার নির্বাচন। অর্থাৎ মফঃস্বল শহরের ক্রিকেট নতুন স্বীকৃতি পেল। মেদিনীপুরের স্বপন দত্তকে আনন্দবাজার পত্রিকা প্রদত্ত পুরস্কারটি দেওয়া হয়। স্যার নৃপেন্দ্রনাথ স্কুলের অরুণ ব্যানার্জি শ্রেষ্ঠ স্কুল ক্রিকেটার ট্রফি পান। মাইকেল দালভি পান বছরের শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটার ট্রফি।

ইস্টবেঙ্গল সিনিয়র লিগ চ্যাম্পিয়ন পি সেন ট্রফি পেয়েছে। মোহনবাগান সিনিয়র নকআউট ট্রফি জয় করে। শ্যামবাজার ক্লাব জুনিয়র লিগ ও নক আউট জয়ের কৃতিত্ব দেখিয়েছে। স্পোর্টিং ইউনিয়ন পেয়েছে জে সি মুখার্জি ট্রফি। কলকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় অজয় ঘোষ প্রতিযোগিতার বিজয়ী ও বিজিত দল। ডন বস্কো স্কুল ট্রফির বিজয়ী এবং রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভবন বিজিত দল।

ইস্টবেঙ্গলের অলোক ভট্টাচার্য সিনিয়র লিগ ও নকআউটে সবচেয়ে বেশী উইকেট পেয়েছেন। জুনিয়র বিভাগে ঐক্য সম্মিলনীর কিশোর দাস এবার ওই সম্মান লাভ করেছেন।

সি এ বি সম্পাদক বিশ্বনাথ দত্ত তার ভাষণে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেননি। তবে জানান, গত মরশুমে ৭৩৭টি ম্যাচের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। এর মধ্যে লিগ ক্রিকেটের ম্যাচের সংখ্যা ৪১৮টি, নক আউটের ৩৭, স্কুলের জন্য ১৮৫টি এবং অন্যান্য প্রতিযোগিতার জন্য বাকি ৬৭টি ম্যাচের ব্যবস্থা হয়।

বর্ধমানে জুনিয়র জাতীয় বাস্কেটবল

স্টাফ রিপোর্টার ঃ আগামী ৮ অক্টোবর থেকে সপ্তাহব্যাপী জুনিয়র বাস্কেটবলের তিরিশতম জাতীয় আসর বর্ধমানের অরবিন্দ স্টেডিয়ামে শুরু হচ্ছে। ২০টি বালক ও ১৫টি বালিকা রাজ্য দল এতে যোগ দেবে বলে এখন পর্যন্ত আয়োজক সংস্থা বর্ধমান জেলা ভলিবল ও বাস্কেটবল অ্যাসোসিয়েশন আশা করছে। বহিরাগত খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদের সংখ্যা প্রায় পাঁচশো হবে।

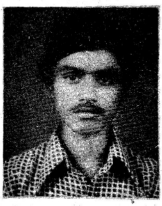
অ্যাসোসিয়েশন স্থির করেছে, নিজেদের স্টেডিয়ামের দুটি হার্ডকোর্টে এবং বর্ধমান টাউন স্কুলের কোর্টে দু'বেলা খেলা হবে। ফ্লাডলাইটের ব্যবস্থা উভয় স্থানেই রয়েছে। দর্শকাসন সাত-হাজার। সিজন টিকিটের দাম ১০০, ৫০ ও ১০ টাকা এবং ছাত্রদের জন্যে ৬ টাকা। দৈনিক টিকিটও থাকছে।

মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ও কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রকে পৃষ্ঠপোষক ও জেলা-শাসক জে ভি আর প্রসাদ রাওকে সভাপতি করে একটি সংগঠনী কমিটি করা হয়েছে। সম্ভাব্য ব্যয় ১ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা যার ৬০ শতাংশ স্থানীয় লোকদের দান থেকে সংগ্রহ করা যাবে বলে উদ্যোক্তারা মনে করে।

উল্লেখযোগ্য, ১৯৭৭-এ প্রাক-এশীয় বাস্কেটবল ছাড়া এই শহরে আর কোন বাস্কেটবলের বড় আসর বসেনি।

ঘাটাল লিগ ফুটবলে

ঘাটাল কলেজ ময়দানে ন্যাশনাল বয়েজ পরিচালিত লিগ ফুটবল শেষ হল। চ্যাম্পিয়নশিপ অর্জন করেছে ঘাটালের কুমারটুলি। বয়েজ ক্লাব, ন্যাশনাল বয়েজ, মিতালী ক্লাব, ভেটারেন্স ক্লাব এবং ইণ্টারন্যাশনাল বয়েজ পর পর স্থান পেয়েছে। এবারের লিগে তিনটি হ্যাটট্রিক হয়েছে। দুটি করেছে মিতালী ক্লাবের পলাশ মল্লিক ও অপরটি কুমারটুলির



লিগে দুটো হ্যাটট্রিক করেছে পলাশ মল্লিক

অলোক ঘোষ। লিগে সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার পায় যুগ্মভাবে অলোক ঘোষ ও পলাশ মল্লিক। উভয়ে সাতটি করে গোল করেছে। প্রতিদিন ঘাটাল ফুটবল লিগের খেলা দেখতে কলেজ মাঠ কানায় কানায় ভরে যেত।

এরপর মেদিনীপুর জেলায় মহকুমা শহর ঘাটালে মহকুমা ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু হবে। জোর কদমে তার প্রস্তুতি চলছে।

পূর্ব ভারত সাইকেল পোলো জিতল রাজস্থান

নারায়ণ ওঝা : মাত্র ক'দিন আগেই বালিগঞ্জের ক্যালকাটা ক্রিকেট ও ফুটবল ক্লাবের মাঠে দুইলের ওপর পোলো অথবা সাইকেল পোলোর দুটি প্রতিযোগিতা হয়ে গেল। প্রথমে কসমস, শ্রীহনুমান জুট মিলস, চিংমারী টি এস্টেট ও জি অ্যাথারটনের একটি সম্মিলিত দল।

বেঙ্গল ন্যাশনাল টেক্সটাইলস ও রাজস্থান সহজেই সেমিফাইনালে চলে যায়। অন্ধ্র দলের জগন্নাথন ও সত্যনারায়ণদের গোলের ফলে শ্রীহনুমান জুট মিলস কোয়ার্টার ফাইনালে ৪—৩ গোলে পরাজিত হয়।



চ্যাম্পিয়ন খেলোয়াড়রা বাঁদিক থেকে রাজবীর সিং, স্বরূপ সিং, হর্ষবর্ধন সিং ও জয় সিং/শঙ্কর

মার্চেন্টস কাপ ও পরে পূর্বভারত সাইকেল পোলো প্রতিযোগিতা।

জাতীয় চ্যাম্পিয়ন রাজস্থান দল যোগদান করায় পূর্ব ভারত প্রতিযোগিতার মর্যাদা বেড়েছে এবার। তবে দিল্লি শেষ পর্যন্ত নাম প্রত্যাহার করায় আকর্ষণ কিছু কম হয়। দিল্লি দল কলকাতায় এসেছিল, কিন্তু প্রতিযোগিতায় রাজস্থানের সঙ্গে একই দিকে রাখায় প্রতিবাদে নাম প্রত্যাহার করে নেয়।

অন্য যে সব দল যোগ দেয় তাদের মধ্যে ছিল্ল বাংলা, বেঙ্গল ন্যাশনাল টেক্সটাইলস, অন্ধ্র, উত্তরপ্রদেশ থেকে হিণ্ডালকো, জয়পুর এ ও বি,

বেঙ্গল ন্যাশনাল টেক্সটাইলস ছাড়া স্থানীয় সব কটি দল পরাজিত হয়। কসমস হারে ১—৬ গোলে জয়পুর-এর কাছে। চিংমারী টি এস্টেট ১৬—৪ গোলে রাজস্থানের কাছে পরাজিত হয়। সেমিফাইনালে রাজস্থান ও জয়পুর 'এ' এবং বেঙ্গল ন্যাশনাল টেক্সটাইলস ও অন্ধ্র প্রদেশ প্রতিযোগিতা করে। রাজস্থান ১৪—১ গোলে জয়ী হয় এবং স্কোরারদের মধ্যে ছিলেন স্বরূপ সিং, হর্ষবর্ধন সিং ও রাজবীর সিং।

দ্বিতীয় সেমিফাইনালে বেঙ্গল ন্যাশনাল টেক্সটাইলস ও অন্ধ্র দলের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা হয়। চার চক্করের খেলা ৫—৫ গোলে অমীমাংসিত থেকে যাওয়ার পর মদন সিং-এর 'সাডেন ডেথ' গোলে বেঙ্গল ন্যাশনাল টেক্সটাইলস জয়ী হয়।

ফাইনালে বেঙ্গল ন্যাশনাল টেক্সটাইলস আগে গোল করলেও রাজস্থান ৪—৩ গোলে জয়ী হয়।

এবারের প্রতিযোগিতার একটি বিষয় আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। ভাল খেলোয়াড় থাকা সত্ত্বেও বাংলা এবার দিল্লিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় প্রতিযোগিতায় যোগ দেয়নি। আমাদের এখন আগামী বছরের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

পি অ্যাণ্ড টি সাঁতারে কেরালা শীর্ষে

নিজস্ব প্রতিনিধি : জুন মাসের ২৫ ও ২৬ তারিখে কলকাতায় সুভাষ সরোবরে নিখিল ভারত পোস্ট অ্যাণ্ড টেলিগ্রাফের দুদিন ব্যাপী সাঁতার ও ডাইভিং প্রতিযোগিতায় কেরালার সাঁতারুরা প্রবলভাবে সাফল্যলাভ করেছেন। একটি সর্বভারতীয় সরকারী প্রতিষ্ঠানের সাঁতারুদের প্রতিযোগিতায় কেরালার পুরুষ ও মেয়ে সাঁতারুরা মোট এগারোটি বিষয়ের মধ্যে ১০টি বিষয়ে সফল। তার মধ্যে সাতটিতে তারা প্রথম হয়েছেন। দুটিতে দ্বিতীয় এবং একটিতে তৃতীয়। পুরুষ ও মেয়ে বিভাগের ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ন ও দলগত চ্যাম্পিয়নশিপ সবই কেরালার সাঁতারুরা জয় করেন।

জে এল লিলিকুমারী ১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোকে, কে কে পিল্লাই ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে ও ১৫০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে জয়কুমার ১০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকে এবং ৪× ১০০ মিটার রিলেতে কেরালার সাঁতারুরা নতুন রেকর্ড (পি অ্যাণ্ড টি) করেন। অন্ধ্র প্রদেশের এস হোসেন ২০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোকে পঞ্চম রেকর্ড করতে সক্ষম হয়েছেন।

পশ্চিমবাংলার পি অ্যাণ্ড টি-র কল্পনা মল্লিক ১০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকে প্রথম ও ১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোকে তৃতীয় হন। মেয়েদের মধ্যে রেখা ঠাকুর ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে দ্বিতীয় হন। ছেলেদের মধ্যে সুজিত বড়াল, সলিল বিশ্বাস, অঞ্জন মজুমদাররা সাঁতারের অন্যান্য বিভাগে খুব ভাল ফল দেখাতে না পারলেও মোটামুটি সাফল্য পেয়েছেন। হাইবোর্ড ও স্প্রিং বোর্ড ডাইভিং-এ রঞ্জন ভট্টাচার্য প্রথম স্থান পান।

এবারের প্রতিযোগিতায় (অষ্টাদশ) মোট ১০টি রাজ্য থেকে ১২৫ জন প্রতিযোগী যোগ দেন এবং জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতায় ১৫ জনের একটি দল যোগ দেবে।

ক্যালকাটা টেলিফোনসের জে চক্রবর্তী প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন এবং পশ্চিম বাংলার পোস্টমাস্টার জেনারেল সি এল দেব সমাপ্তি উৎসবে উপস্থিত থাকেন।

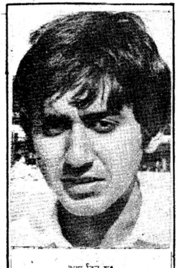
আগামী দিনের গাভাসকর

বোম্বাই থেকে প্রদীপ বিজয়কর : ক্রিকেটের বড় অঙ্গনে আবির্ভাবেই সুনীল মনোহর গাভাসকর তার গৌরবময় ভবিষ্যতের সম্ভাবনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় কোন্ বলটা খেলতে হবে, আর কোনটা নয়। অবশ্য তখন তার বয়স একুশ।

আর সাদ বিন জং? মাত্র আঠারো বছর বয়সেই সেই বিচক্ষণতা রপ্ত করেছে। সে যে অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় ক্রিকেটের উন্নত মার্গের ব্যাটসম্যানদের স্তরে পৌঁছতে পারবে এমন ধারণা দৃঢ় করে তুলেছে সামান্য কয়েকটি দিনেই।

গত ক্রিকেট মরশুমে সফররত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিরুদ্ধে বাইশ বছরের কমবয়সী ভারতীয় দলের হয়ে সে অর্ধশতরান পায় এবং দক্ষিণাঞ্চলের হয়ে পায় এক সম্ভাবনাপূর্ণ চমকপ্রদ সেঞ্চুরি।

কিন্তু সাদ-এর কয়েকটি দোষও রয়েছে। তার মন্থর ফিল্ডিং দেখে অনেকে প্রশ্ন করেন, বড় ম্যাচে কি তার হয়ে মামা মনসুর আলি খান পতৌদি ফিল্ডিং অথবা উইকেটের মধ্যে দৌড়ে দেবে? অবশ্যই তারা ভাল করেই জানেন, ভারতীয় দলের এমন অনেক শ্লথগতি ফিল্ডার আছে যাদের জন্য ম্যাচ বোলারদের হাতছাড়া হয়ে যায়। মে মাসে বোম্বাইতে জুনিয়র ক্রিকেটারদের জাতীয় শিক্ষণ শিবিরে সাদকে বেশ কষ্টকর অনুশীলন করান হেমু অধিকারী এবং সে তাতেও বিশেষ উন্নতি ঘটাতে পারেনি। অবশ্য সে যখন বল করার জন্য দৌড়য় তখন মনে হয় সমস্ত বিশ্বের দায়িত্ব যেন



সাদ বিন জং

তার কাঁধে বর্তেছে।

কিন্তু এভাবে সে তার বদভ্যাসগুলি বেশী দিন টিকিয়ে রাখতে চাইবে না। কারণ ক্রিকেটে আজকের দিনে বহু ঝুঁকি রয়েছে, এই ধারণা তাকে উদ্বুদ্ধ করবে ত্রুটি সংশোধনে, আরও বেশী উদ্যোগ নিতে। দেখা যাক ভবিষ্যতে সে কেমন খেলে। এটা নিশ্চিতভাবে দুঃখের হবে যদি ভারত এমন একজন ওপেনিং ব্যাটসম্যান খুঁজে পায় যে যত রান ব্যাট নিয়ে করে, তত রান হাত ফসকায় ফিল্ডিং এর সময়।

এখানে স্মরণ করা যেতে পারে গাভাসকর যখন পাদপ্রদীপের আলোয় এসেছিল তখন সেও ফিল্ডার হিসেবে উন্নত ছিল না। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ায় এক সফরে সে প্রথম শ্রেণীর ফিল্ডার বনে গেল। অনেকেরই আশা, সাদ-এর ক্রিকেট পথে এমন সুযোগ এসে যাবে। তাছাড়া আগামী দিনগুলিতে যখন লাইন দিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট দলের সফর চলতে থাকবে, হয়তো এই সমস্যা তখন কেটে যাবে।

দক্ষিণাঞ্চলের হয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে সাদ সুযোগ পায় বিশ্বনাথ আহত থাকার জন্যে। কিন্তু সে দ্রুত বল করিয়েদের বেশ তাড়াতাড়ি রপ্ত করে নেয়। সব থেকে দর্শনীয় হচ্ছে তার ব্যাটিং-এর ছন্দ এবং বলটির গতিপথ শেষ পর্যন্ত দেখে খেলার মেজাজ। এটা বোঝা খুবই দুরূহ কি করে একটি স্কুল ছাত্র ক্রিজে গিয়ে এমন অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যানে পরিণত হল। অবাক হবার মতো কথা, এই ক্রিকেটারটি এখনও হায়দ্রাবাদে সিনিয়র লিগ খেলেনি।

সে এ পর্যন্ত বড় ম্যাচ খেলেছে খুবই কম। ১৯৭৭-৭৮ মরশুমে সে হায়দ্রাবাদ স্কুল ও দক্ষিণাঞ্চল স্কুল দলে খেলেছে। এছাড়া সি কে নাইডু (বাইশ বছরের নীচে) ক্রিকেট টুর্নামেন্টেও খেলেছে। তার মধ্যে একটা সুপ্ত সম্ভাবনা রয়েছে বলে অনেকে মনে করলেও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে তার সাফল্য অনেকেরই ধারণার অতীত ছিল। সে রঞ্জি ট্রফিতে প্রথম খেলতে নেমে কেরালার বিরুদ্ধে বোনাস পয়েন্ট পাবার জন্য যে ত্বরিৎ গতি ৫৮ রান দেয় তাও নিশ্চয়ই উল্লেখের অপেক্ষা রাখে।

মামা পতৌদির প্রভাব সাদ-এর উপর কেমন? আসলে তা খুব সামান্যই। টাইগার খুবই আত্মস্থ মানুষ এবং তার প্রভাব খুবই সীমিতসংখ্যকের জন্য নির্দিষ্ট। বরং লালা অমরনাথের প্রভাব সাদ-এর উপর যথেষ্ট। কারণ কয়েক বছর আগে লালা হায়দ্রাবাদে নবীন শিক্ষার্থীদের ক্রিকেটের পাঠ দিতেন। জয়সীমা ও আবিদ আলি তার সাহস, উৎসাহ। তাছাড়া সাদ-এর মা-বাবা ও হায়দ্রাবাদ পাবলিক স্কুল (যারা ক্রিকেটে বিশেষ উৎসাহ দিয়ে থাকে) গড়ে ওঠার প্রথমদিকে তাকে সাহস যুগিয়েছে। বড় ভাই আমিরও ভাল ক্রিকেটার।

তার মধ্যে মনসুর আলির উপস্থিতি হচ্ছে ভঙ্গি এবং হাফ-কাট ও হাফ-ডাইভের মধ্যেই সীমিত। সাদের হাতের এই মারগুলো চোয়াল ভাঙ্গা গোছের তীব্রগতি যেমন মনসুর করতো। অফ সাইডে সাদ যখন তার সুন্দর মারগুলিকে পুরোপুরি সড়গড় করে ফেলবে সে তখন দুই চোখঅলা পতৌদি রূপ পাবে।

কয়েকবছর আগে টম গ্রেভনি গাভাসকরের ব্যাটিং দেখে বলেছিলেন, এ চোখ হারানোর আগের পতৌদি।

তবে একজন উদীয়মানের পক্ষে পতৌদি ও গাভাসকরের মিলিত প্রতিচ্ছবি দেখা মোটেই খারাপ হবে না।

ঢাকায় ভারতীয় দাবা দলে বাংলার কেউ নেই

হিমানীশ গোস্বামী ঃ

ভারত থেকে পাঁচ জন বাংলাদেশে দাবা খেলতে গেলেন। এটি শুরু হয়েছে ১৪ জুলাই, অর্থাৎ এই লেখাটি যখন আপনারা পড়বেন তখন সে খেলা হয়ত শেষও হয়ে যাবে। ভারতীয় দলে রয়েছেন মহম্মদ হাসান, রফিক খান, ম্যানুয়েল আরন, পরমেশ্বরন এবং নাজির আলি। পাঠকরা লক্ষ্য করবেন নিশ্চয়ই যে এই টিমে পশ্চিমবাংলা থেকে একজনও নেই। এটি আমাদের পক্ষে সত্যিই খুব আক্ষেপের কথা। ভারতই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে, তার উপর পশ্চিমবঙ্গের এই হাল। কিছুদিন আগে জাতীয় প্রতিযোগিতায় প্রথম পনের জনের মধ্যে আমাদের প্রায় একমাত্র আশা দিব্যেন্দু বড়ুয়া কোনমতে ১৫তম হতে পেরেছিল, কিন্তু ১৫তম হয়েও সে পরবর্তী প্রতিযোগিতায় যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি, কেন না দুজন ১৫তম হয়েছিল এবং গুণ গত বিচারে দিব্যেন্দুকে পিছিয়ে থাকতে হয়েছিল। এটা খুবই সম্ভব দিব্যেন্দু ওই সময় ফর্মে ছিল না। কিন্তু পশ্চিমবাংলার সকলেই ফর্মে ছিলেন না একথায় আত্মতুষ্ট হয়ে থাকা চলে না। হয়ত প্রায় সর্বক্ষেত্রে যেমন বাঙালীরা পিছিয়ে পড়ছে দাবার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। সম্প্রতি একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে বোম্বাই, দিল্লি এবং মাদ্রাজ শহরের কিশোরদের মধ্যে অপুষ্টি কমছে আর ঠিক সেই সময়েই কলকাতার ছেলেদের অপুষ্টি বাড়ছে। এর জন্য দায়ী কে, কেন, ইত্যাদি প্রশ্ন পরে আসবে, কিন্তু এটাই হল ঘটনা। ঘটনা হল দাবার ক্ষেত্রে বাঙালীরা পিছিয়েই রয়েছে।

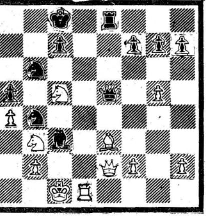
হয়ত সার্বিক উন্নতি হলে দাবারও উন্নতি হবে কোনো একদিন। কিন্তু সেটা তো যদির কথা। জাতি হিসেবে আমরা দাবার জন্য কিছু না করলে কোনদিনই কিছু হবে কি? হঠাৎ কি আজকাল কেউ ফিশার, কারপভ বা করশনয় হয়ে যেতে পারবে আমাদের ভেতর থেকে? এটা বিশ্বাস করা যায় না। আর সাড়ে চার কোটি মানুষের রাজ্যের দু'এক জনের উপর ভরসা করে থাকাও চলে না। দাবার জন্য চাই এর ব্যাপক বহু প্রসার। প্রথমেই গুণগত শ্রেষ্ঠত্ব আসে না। লক্ষ কিশোর প্রতিযোগিতামূলক দাবা খেললে তবেই তা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে (আসবেই যে তার পুরো গ্যারাণ্টি নেই) দু' একজন বড় খেলোয়াড়। হয়ত আগামী পঁচিশ কি ত্রিশ বছরের চেষ্টায় হতে পারেন দু' চারজন গ্র্যাণ্ডমাস্টার। যেমন হয়েছে বৃটেনে। বহু যুগ ধরে বৃটেনে গ্র্যাণ্ডমাস্টার বলতে কেউ ছিলেন না। কিন্তু এখন সেই বৃটেনে গ্র্যাণ্ডমাস্টারের সংখ্যা চারজন। ওই দেশে আরও কয়েকজন গ্র্যাণ্ডমাস্টার হবার সম্ভাবনা।

এসব তো একদিনের চর্চার ব্যাপার নয়। ভগবান বলেন, লেট দেয়ার বি লাইট, অ্যাণ্ড দেয়ার ওয়াজ লাইট। কিন্তু কেউ বলতে পারেন না, পশ্চিমবঙ্গে পাঁচজন গ্র্যাণ্ডমাস্টার হোক, আর সঙ্গে সঙ্গে তা হয়ে যাবে! এর জন্য খেলোয়াড়দের তো এগিয়ে আসতে হবেই, আর সৃষ্টি করতে হবে দাবার পরিবেশও। ধরা যাক বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের কথা—টাটা, বিড়লা, ব্রুক বণ্ড, বাটা ইত্যাদি। এরা ইচ্ছা করলে প্রত্যেকে দাবার জন্য এক লক্ষ টাকা খরচ করতে পারেন এ রাজ্যে। বৃত্তির ব্যবস্থা করতে পারেন—দিব্যেন্দু, নীরজ মিশ্র ইত্যাদির ট্রেনিং এর জন্য। কিছু প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করতে পারেন আর তার সঙ্গে ঘোষণা করতে পারেন আকর্ষণীয় পুরস্কারও। এই ভাবেই পরিবেশ গড়ে ওঠে। পরিবেশ গড়ে তোলা যায়।

পরিবেশ গড়ার ব্যাপারে আলেখিন চেস ক্লাবের নাম মনে পড়ে, আর মনে পড়ে এর এক অসম সাহসী কর্মী কমলেশ সেনগুপ্তর কথা। কমলেশ একটি দাবা টিম (আলেখিন চেস ক্লাব থেকে সংগৃহীত) নিয়ে ঢাকায় গিয়েছে ও সেখান থেকে একটি চিঠি দিয়েছে। তা থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিই ঃ

'আমরা ৪ সদস্যের এক দাবা দল নিয়ে গত ২২ জুন এসে পৌঁছেছি। এখানকার নব দিগন্ত সংসদ আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল এখানকার ৬ষ্ঠ এস এ মহসীন স্মৃতি দাবা টুর্নামেণ্টে যোগ দেওয়ার জন্য। আমাদের সঙ্গে খেলোয়াড় হিসেবে এসেছেন লীলা বিশ্বাস, প্রদ্যোৎ কুমার ঘোষ, বিপিন সেনয় এবং সঞ্জয় সোমানি। এখানকার শাইনুল ইসলাম (মুকুল) আমাদের নানা বিষয়ে সাহায্য করছে। এখানে আমাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা বিনামূল্যে। বাংলাদেশ সরকার খেলাধুলার ব্যাপারে প্রচুর টাকা পয়সা খরচ করছে। এখানে বাইরের খেলোয়াড় এবং কোচদের জন্য নিজস্ব হোস্টেল আছে। ব্যবস্থাদি চমৎকার। আমরা এই রকমই একটা হোস্টেলে রয়েছি। নাম ন্যাশনাল স্পোর্টস কাউন্সিল বোর্ড হোস্টেল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স কাফেটেরিয়াতে ২৩ তারিখ থেকে খেলা শুরু হয়েছে। সব সমেত ১০২ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছেন। নারী প্রতিযোগীর সংখ্যা তেমন নয়, মাত্র ৪ জন। বাংলাদেশের সমস্ত ন্যাশনাল খেলোয়াড়ই এতে অংশগ্রহণ করেছে। এখন পর্যন্ত পঞ্চম রাউণ্ড খেলা হয়েছে। সর্বোচ্চ পয়েণ্ট পেয়ে এগিয়ে আছে এখানকার জাতীয় চ্যাম্পিয়ন নিয়াজ মুরশেদ। এর বয়স মাত্র ১২। চতুর্থ স্থানে আছে আমাদের প্রদ্যোৎ কুমার ঘোষ এবং বিপিন সেনয়। লীলাদি সংগ্রহ করেছেন আড়াই পয়েণ্ট। প্রথম পুরস্কার হাজার টাকা।...'

কমলেশের চিঠি থেকে অনেক কথাই জানা গেল। বাংলাদেশ সরকার স্পোর্টসের জন্য যথেষ্ট খরচ করে থাকে এটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তা ছাড়া বাইরের লোকদের থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত বিনামূল্যে করাও বেশ ভাল খবর। আর এদিকে আমাদের এই কলকাতায় বাইরে থেকে খেলোয়াড়রা এলে তাদের জন্য কোথায় জায়গা দেওয়া হবে তা নিয়ে রীতিমতো আতঙ্কজনক অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যায়। পশ্চিমবঙ্গ দাবা অ্যাসোসিয়েশনের একটা নিজস্ব ভবনই এ পর্যন্ত হল না, হল না একটা খেলার হল। এসবই হয়ত একদিন হবে, কিন্তু এ বিষয়ে উদ্যোগ এখন থেকেই নেওয়া দরকার। সবই অন্যের উপর এবং ভবিষ্যতের উপর ফেলে রাখা আমাদের জাতীয় অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে।



আজ দাবার একটা ধাঁধা দেওয়া হল। এর উত্তরও সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হল। ধাঁধাঁটি হল, সাদাকে জিততে হবে। তবে এর নিশ্চয় একাধিক উত্তর সম্ভব—কিন্তু ১৯০৭ সালে ডুরাস (সাদা) র সঙ্গে স্পিয়েলমান (কালো) র খেলায় ডুরাস চাল দিয়েছিল এইভাবে ঃ

১. ঘো × বো! বো—নৌ ৪;
২. বো × গ, ম × বো +;
৩. রা—ঘো ১, ম × ঘো;
৪. নৌ—ম ৮ + কালোর পরাজয় স্বীকার।

শব্দ জব্দ

স্বরাজ কুমার সাহা
ডায়মণ্ডহারবার হাইস্কুল
পোস্ট : ডায়মণ্ডহারবার,
জেলা : ২৪ পরগণা।

পাশাপাশি :

১। এ পর্যন্ত ১১টি গোল করে এই মরশুমে প্রথম ডিভিসন ফুটবল লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতার স্থানটি নিজের আয়ত্তে রেখেছেন এই ভিনদেশী ফুটবলার।

২। সাধারণত ব্রিজ (তাস) খেলায় ব্যবহৃত হয় এই শব্দটি।

৫। ১৯৭৪-৭৫ ভারতঃওয়েস্ট ইণ্ডিজ টেস্ট ক্রিকেট সিরিজে এই ক্যারিবিয়ান বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যান বোম্বাই টেস্টের প্রথম দফায় একটি দু'শত রানের বাহারি ইনিংস খেলেছিলেন।

৭। অস্ট্রেলিয়ার এই বিশ্বখ্যাত প্রাক্তন উইকেটকিপার দলের সহ খেলোয়াড়দের কাছে এই নামে পরিচিত ছিলেন, রুদ্র মূর্তিতে বিপক্ষ ব্যাটসম্যানকে ঘায়েল করার জন্য।

৮। ১৯৭০-এ ব্যাংকক এশিয়ান গেমসে মহিলাদের ৪০০ মিটার দৌড়ে সোনা জয়ী অ্যাথলিট।

উপর-নীচ :

১। মাঠে অখেলোয়াড়োচিত আচার ব্যবহারের জন্য মহঃ স্পোর্টিং-এর দীর্ঘকায় ফুটবলারকে ক্লাব কর্তৃপক্ষ ১ বছরের জন্য সাসপেণ্ড করেছেন।

৩। ১৯৫৬ মেলবোর্ন ওলিম্পিকে ভারতীয় ফুটবলের দলনায়ক।

৪। কলকাতা ময়দানের দুই শরিকের প্রথম সাক্ষাৎকারে মোহনবাগানের বুকে শেল হেনেছিলেন এই খেলোয়াড়।

৬। ১৯৭৮-এ পাকিস্তান সফরকারী ভারতীয় ক্রিকেট দলের বিপক্ষে এই পাকিস্তানী ক্রিকেটার ব্যাট হাতে ত্রাসের সৃষ্টি করেছিলেন।

৯। বর্তমানে ইংল্যাণ্ড সফররত ভারতীয় ক্রিকেট দলের এই অলরাউণ্ডার কাউণ্টি ম্যাচে ৭৪ মিনিটে ১০০ রান করে সকলকে তাক লাগিয়েছে। ●

এ ছকটি অবশ্যই পূরণ করে শব্দজব্দের সঙ্গে পাঠান।

নাম ____________

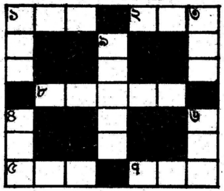
অভিভাবকের নাম ____________

ঠিকানা ____________

বিদ্যালয় ____________

বিদ্যালয় প্রধানের স্বাক্ষর ____________

বিদ্যালয়ের সীলমোহর ____________

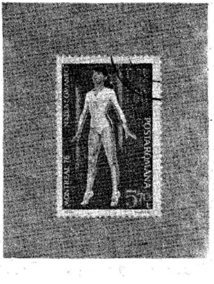


ডাকটিকিটে খেলাধূলা

তপন রায় : কানাডার মণ্ট্রিয়লে একবিংশতিতম ওলিম্পিকের আসরে একটি মেয়ের নাম বারবার উচ্চারিত হয়েছিল। সে রোমানিয়ার ছোট্ট মেয়ে নাদিয়া কোমানেচি। বয়স মাত্র চোদ্দ বছর। জিমন্যাস্টিক্স জগতে ওলিম্পিকের সব নামীদামী গুণী মহিলাদের সমস্ত কৃতিত্বকে সে ম্লান করে দিয়েছিল।

জিমন্যাস্টিক্স নাকি সৌন্দর্যের খেলা। সেই সৌন্দর্যকে আরও বর্ণময়, রূপময় করে তুলেছিল এই নাদিয়া। শুধু তার অপরূপ শারীরিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। মণ্ট্রিয়ল জিমন্যাস্টিক্সে এক একটা মুহূর্ত ছিল যেন এক একটা নতুন চমক। সেদিনে তার কাণ্ড-কারখানা দেখে সকলে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গিয়েছিল। বিচারকরাও তার এই অনন্য কৃতিত্বের মর্যাদা দিতে কার্পণ্য করেননি! মণ্ট্রিয়ল ওলিম্পিক্সে নাদিয়ার ভাগ্যে জুটেছিল মূল্যবান ছ'টি পদক—চারটি সোনা, একটি রুপো ও একটি ব্রোঞ্জ। এর মধ্যে একটি স্বর্ণপদক ছিল তার সর্বশ্রেষ্ঠার স্বীকৃতি—একক চ্যাম্পিয়নের পুরস্কার।

নাদিয়ার নিজের দেশ রোমানিয়াও তাকে সম্মান জানাতে দ্বিধা করেনি। মণ্ট্রিয়ল ওলিম্পিকে পদকজয়ী সাত রোমানিয়ান খেলোয়াড়কে সম্মান জানাতে রোমানিয়া সাতটি রঙিন ডাকটিকিট প্রকাশ করে। এর মধ্যে সবচেয়ে অধিক মূল্যের ডাকটিকিটে (ছবি) এই নাদিয়া কোমানেচিকে মূর্ত করা হয়েছে। এই ছোট্ট মেয়েই ছিল রোমানিয়ার পদক বিজয়ীদের মধ্যে শীর্ষে। তাই বোধহয় এই সিরিজের সবচেয়ে মূল্যবান ডাকটিকিটটিতেই তাকে সম্মান জানানো হয়েছিল। ●



এ টি পি কম্পুটারে বিজয় অমৃতরাজের স্থান ৩০তম



লণ্ডন থেকে সুব্রত সরকার

অ্যাসোসিয়েশন অব টেনিস প্রফেশন্যালস (এ টি পি) কম্পুটারে বিশ্বের টেনিস খেলোয়াড়দের যে শেষ তালিকা প্রস্তুত করেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে বিজয় অমৃতরাজের স্থান ত্রিশতম। অথচ গত আট বছর ধরে উইম্বলডন প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়ার মধ্যে বিজয় সাত বারই দ্বিতীয় রাউণ্ডের বেশী এগিয়ে যেতে পারে নি।

অন্তত রেকর্ড তাই বলে। অথচ এবারে জুন মাসের ২৭ তারিখের বিকেলে (বুধবার) ভারতীয় সময় সওয়া ন'টার সময় বিজয় অমৃতরাজ তিনবারের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন সুইডেনের বিয়র্ণ বর্গকে ২-১ সেটে পিছনে রেখে চতুর্থ সেটে ৩-১ গেমে এগিয়েছিলেন। খেলাটি উইম্বলডনের এক নম্বর কোর্টে চলছিল।

বিজয় ঠিক ওই অবস্থায় পৌঁছে হারতে শুরু করলেন এবং ঠিক একইভাবে বর্গ এগিয়ে যেতে লাগলেন। অথচ দুজনেই প্রচণ্ড প্রতিভাবান খেলোয়াড়। তবে দুজনের মধ্যে একটি বিষয়ে আকাশ পাতাল প্রভেদ রয়েছে। বর্গ ক্ষণজন্মা এবং অসাধারণ খেলোয়াড়। সম্পূর্ণ বিপরীত পরিস্থিতির মধ্যে লড়াই চালান। বিজয়ের ঘাটতি ওইখানে। নেই প্রচণ্ড মানসিক শক্তি—যা থাকলে বিজয় সেদিন বিজয়ী হতে পারতেন।

প্রথমে বিজয় নিজের সার্ভিসে গেম হারালেন। বর্গের ফিরতি মার সামলাতে পারলেন না। গেম হারলেও তখনও বিজয় এক সেটে এগিয়ে আছে। চতুর্থ সেটটি শেষ পর্যন্ত টাইব্রেকারে নিষ্পত্তি হল (৬-৬)। টাইব্রেকারেও বিজয় দু-পয়েন্টে এগিয়ে। তারপর বর্গ পরপর সাতটি পয়েন্ট পেলেন। পঞ্চম সেট বর্গ পেলেও বিজয় সাতবার ম্যাচ পয়েন্ট থেকে খেলাকে ফিরিয়ে আনেন।

বর্গ-বিজয় দ্বিতীয় রাউণ্ডে পৌনে তিনঘণ্টা খেললেন। টেনিসের মান অসাধারণ পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। শ্বাসরুদ্ধকারী খেলা দেখলেন সকলে, যারা কোর্টের মধ্যে ছিলেন অথবা যাদের চোখ ছিল টেলিভিসনের পর্দায়। দুজন খেলোয়াড়ের মেজাজ ছিল আদর্শ।

বিজয়ের পক্ষে ওই ম্যাচ তিনদিনের মধ্যে দুটি পাঁচ সেটের খেলা। প্রথম রাউণ্ডে অস্ট্রেলিয়ার দাড়িওয়ালা খেলোয়াড় মার্ক এডমণ্ডসনকে ২ ঘণ্টা ২৭ মিনিটের লড়াইতে হারান। বাস্তবিক পক্ষে ওই দিন (২৫ জুন) বিজয় ছিলেন একমাত্র ভারতীয় বিজয়ী খেলোয়াড়।

উইম্বলডম যেদিন শুরু হয় সেদিনটি ছিল প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ও মেঘলা। এর আগে আনন্দ অমৃতরাজ ও রমেশ কৃষ্ণাণ হেরেছেন। আনন্দ হারেন জার্মানির আঁদ্রে মোরের কাছে স্ট্রেট সেটে। তবে দুটি সেটের খেলা টাইব্রেকারে নিষ্পত্তি হয়।

রমেশ হারেন ১৯ বছর বয়সের ফ্রান্সের ইয়ানিক নোয়ার কাছে। নোয়াকে হয়ত অনেকের মনে আছে। কলকাতায় অনুষ্ঠিত গ্রাঁ প্রি-তে বিজয়ী হয়েছিলেন। রমেশ বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি। রমেশ ওই সপ্তাহে নিউজিল্যাণ্ড ক্লাব আয়োজিত প্রতিযোগিতায় এক নম্বর বাছাই থাকা সত্ত্বেও ডেনমার্কের অখ্যাত মরটেনসেন-এর কাছে ৬-৪, ৩-৬ এবং ৬-৪ সেটে হারে। রমেশ ফরাসী লন টেনিসের জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন হয় এর আগে।

উইম্বলডনের প্রাথমিক পর্যায়ে নন্দা বাল তৃতীয় রাউণ্ডে এবং শঙ্কর কৃষ্ণাণ দ্বিতীয় রাউণ্ডে হারেন।

কাজেই বিজয় প্রথম রাউণ্ডে তীব্র লড়াইয়ে জয়ী হওয়ার পর অনেকে আশা করেছিলেন, হয়ত বর্গকে হারাবেন। বিজয় প্রায় সম্ভব করে এনেছিলেন। কিন্তু মনে রাখা উচিত প্রায় জয়ী হওয়া ও প্রকৃত ক্ষেত্রে জয়ী হওয়ার মধ্যে তফাৎ আছে। তবে সেটা সম্ভব হলে উইম্বলডনে বড় রকমের অঘটন ঘটতে পারত।

মহিলা হকি দলের নির্বাচন

উদয়পুর থেকে মারুফ উল হক: বিশ্বকাপ মহিলা হকি ও প্রি-ওলিম্পিকের জন্য ভারতীয় দলের নির্বাচন হয়ে গেছে। প্রথম আসরটি বসছে ১৬ আগস্ট কানাডার ভ্যানকোভার-এ। সেখানে যোগ দিচ্ছে ভারত-সহ কুড়িটি দেশ—হল্যাণ্ড, পশ্চিম জার্মানি, নিউজিল্যাণ্ড, ওয়েলস, ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, আর্জেণ্টিনা, আয়ারল্যাণ্ড, কানাডা, স্কটল্যাণ্ড, আমেরিকা, জাপান, স্পেন, ভারত, ত্রিনিদাদ, বারমুডা, বাহরীন, ফিজি, হংকং ও জাম্বিয়া।

এই আসরের জন্য ভারতীয় দলে নির্বাচিত হয়েছেন ফিলোমিনা ত্রিনিদাদ, উয়েলমা ডি সিলভা, লয়াইন ফারনাণ্ডেজ (বোম্বাই), পুষ্পিন্দর কল, হরপ্রিত গিল (বিশ্ববিদ্যালয়) গঙ্গোত্রী ভাদুড়ি, বর্ষাসোনী এলিসা (রেলওয়েজ), রূপা সোনী (পেপসু), সুধা চৌধুরী, প্রেমমায়া (উত্তরপ্রদেশ), সুদর্শন বাজওয়া (পাঞ্জাব), নাজলীন মাদ্রাজওয়ালা, গীতা সারীন (মহারাষ্ট্র), মধু যাদব (মহাকোশল)।

গত বিশ্বকাপের আসরে ভারত স্থান পেয়েছিল সপ্তম। গতবারের খেলোয়াড়দের মধ্যে রূপা, লুনা পুষ্পিন্দর, হরপ্রিত, বর্ষা, এলিসা এবারের দলে স্থান করে নিয়েছে। প্রি-ওলিম্পিকের জন্য স্থান পেয়েছে নির্মল, রেখা, নিশা, সোনিয়া। গত বছরের দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে এবারে স্থান করে নিতে পারেনি আরজিন্দর, মৃদুলা, ইরোমিনা ও রজনী।

প্রাক-ওলিম্পিকের আসর ১৮ আগস্ট থেকে বসছে মস্কোতে। এই প্রতিযোগিতার জন্য ভারতীয় দলে নির্বাচিত হয়েছেন: মার্গারেট টসকোনস, রেখা মুণ্ডাপান, নীলম শারদ, ভালবিন্দর বাবলা (রেল), লোরেটা ডি' সুজা (গোয়া), স্মরণজিৎ, সুরজিত বাজওয়া, নিশা শর্মা (পাঞ্জাব), উর্বশী, রোটেলা, হরপ্রিয়া (উত্তরপ্রদেশ), সোনিয়া অ্যালবুকুরেকিউ (বোম্বাই), মীণাক্ষী, নীলু নাগপাল (বিশ্ববিদ্যালয়), ওমানা কুমারী (কেরালা), জ্যোতি (দিল্লি), নির্মল কুমারী (পেপসু)।

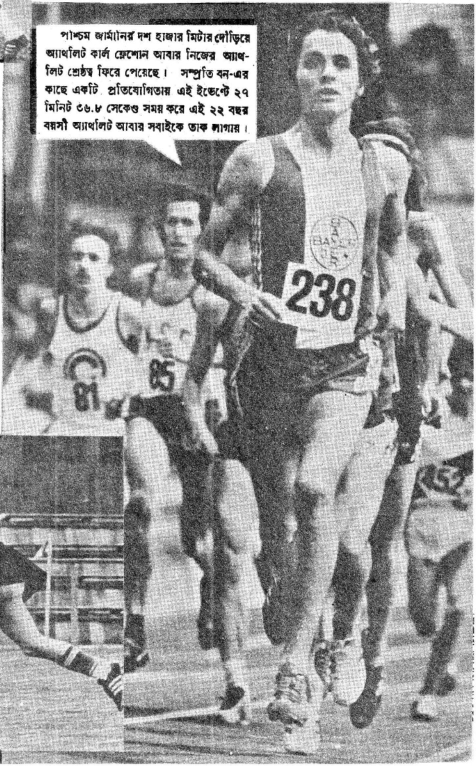
গত ১৩ জুলাই সংখ্যার ৪৩ পৃষ্ঠায় উপরের ছবিটির ক্যাপসন হবে 'মহমেডান স্পোর্টিং: রেলওয়ে ফুটবল ক্লাবের খেলায় রেলওয়ে দলের গোলমুখে'—ভুলক্রমে মহমেডান স্পোর্টিং-এর বদলে মোহনবাগান ছাপা হয়েছে। এজন্য আমরা দুঃখিত।

—সম্পাদক।



ক্লজ ফিশার পশ্চিম জার্মানির ফরোয়ার্ডদের মধ্যে (সাদা জার্সি) সব থেকে বেশী লাফাতে পারে। এই হেড থেকে তার দেওয়া গোলে রেক্সহামে পশ্চিম জার্মানিকে ওয়েলস্-এর বিরুদ্ধে ২-০ গোলে জিততে সাহায্য করে। এই জয়ের ফলে পশ্চিম জার্মানি ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপের সাত নম্বর গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পথে অনেক এগিয়ে গেল। গ্রুপ-বিজয়ীরা ১৯৮০ সালে ইতালিতে চূড়ান্ত চ্যাম্পিয়নশিপে খেলতে পারবে। গ্রুপের অন্য ২টি দল তুরস্ক ও মাল্টা। প্রথম সাক্ষাতকারে এই দুটি দলকেও হারানোর সুবাদে পশ্চিম জার্মানি এখন ছ'পয়েন্ট পেয়েছে। গ্রুপে তিনটি দলের বিরুদ্ধে এবার রিটার্ন ম্যা পশ্চিম জার্মানি স্বভূমিতে খেলবে।

এই খেলায় ২৫ মিনিট পর্যন্ত পশি জার্মানি খুবই খারাপ খেলে। ২৯ মিনি জিমেরম্যান (ছবিতে সব থেকে ডানে) প্রথ গোল করার পর পশ্চিম জার্মানি অনেক উন্ন ফুটবল খেলে এবং ওয়েলসকে অকেজো ক দেয়—এ কথা লিখেছে দৈনিক পত্রিকা 'ড ওয়েল্‌ট'। 'ডেলি মিরর' লিখেছে, 'আব পশ্চিম জার্মানি বিশ্ব ফুটবল অঙ্গনে সবথে উঁচু স্থানটি পেতে চলেছে।'



পশ্চিম জার্মানির দশ হাজার মিটার দৌড়িয়ে অ্যাথলিট কার্ল ফ্লেশোন আবার নিজের অ্যাথলিট শ্রেষ্ঠত্ব ফিরে পেয়েছে। সম্প্রতি বন-এর কাছে একটি প্রতিযোগিতায় এই ইভেন্টে ২৭ মিনিট ৩৬.৮ সেকেণ্ড সময় করে এই ২২ বছর বয়সী অ্যাথলিট আবার সবাইকে তাক লাগায়।

মস্কো ওলিম্পিকে মহিলা হকি সংযোজিত হয়েছে। ফেডারেল রিপাবলিক জার্মানি সেখানে একটি দল পাঠাবে। তাই প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গেছে সেদেশে। ২১ জন খেলোয়াড় নিয়ে যে জাতীয় শিক্ষণ শিবির চলছে তাতে সর্বকনিষ্ঠা অষ্টাদশী ক্রিশ্চিয়েন মোজের। ছবিতে মোজেরকে গোল-রক্ষিকা সুজি শ্‌মিট-এর মুখোমুখি দেখা যাচ্ছে। শিবিরের বয়োজ্যেষ্ঠা একত্রিশ বছরের।

দলটিকে ঠিক ঠিক মতো গড়ে তোলার জন্য এবছর ১৩টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলানো হবে যার মধ্যে আগস্টে অনুষ্ঠিত ভ্যাঙ্কুবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ রয়েছে। জাতীয় কোচের আশা সেখানে একটা মেডেল অন্তত জার্মান দল পাবে।

১৯৮০ সালে ওলিম্পিক শুরুর আগে পর্যন্ত আরও চোদ্দ থেকে ষোলটা আন্তর্জাতিক ম্যাচেও জার্মান মহিলা দলটি অংশ নেবে।



লিগের অন্য খেলায়

স্টাফ রিপোর্টার : ১০ জুলাই খিদিরপুর তাদের চতুর্দশ ম্যাচে উয়াড়িকে নামমাত্র গোলে হারিয়ে সপ্তম জয় ঘরে তুলল। সোমনাথ ব্যানার্জি খেলার গোলদাতা। সোমনাথ এই মরশুমে দলের হয়ে গোল করল চারটি। ১৪টি ম্যাচ থেকে খিদিরপুর পয়েন্ট পেয়েছে ১৭। সম সংখ্যক ম্যাচ খেলে উয়াড়ির অর্জিত পয়েন্ট ১২। খিদিরপুর গতবারের পঞ্চম স্থান বজায় রাখতে না পারলেও বেশ উপরের দিকে থাকবে বলে বিশ্বাস।

এদিনের অপর খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে পুলিশ ও কুমারটুলির মধ্যে। দু'দলই অবনমনের শঙ্কায় আতঙ্কিত। তাই একটি করে পয়েন্ট উভয়কেই স্বস্তি দিয়েছে। পুলিশ তেরটি ম্যাচের মধ্যে মাত্র একটি জয় পেয়েছে—ওদের পয়েন্ট মাত্র ৭। কুমারটুলি ১৪টি ম্যাচে ইস্টার্ন কম্যাণ্ডের বিপক্ষে পাওয়া ওয়াকওভার ধরে জিতেছে মাত্র দুটিতে।

১১ জুলাই দুটি খেলা ছিল এবং দুটিই গোলশূন্য ড্র। যারা মাঠের নিয়মিত যাত্রী, তাদের বক্তব্য—এ খেলার ফল তো মাঠের বাইরেই ঠিক করা! এদিন একটি খেলা ছিল হাওড়া ইউনিয়ন ও ভ্রাতৃ সংঘের মধ্যে। দু'দলই রেলিগেশন থেকে বাঁচার লড়াই চালাচ্ছে। ১৪টি ম্যাচে হাওড়ার সংগৃহীত পয়েন্ট মাত্র ৯। ইস্টার্ন কম্যাণ্ড ম্যাচ ধরে ভ্রাতৃ ১৬টি খেলায় পয়েন্ট কুড়িয়েছে ১২।

অপর খেলাটি ছিল কাস্টমস ও বি এন আর-এর মধ্যে। পুনরায় প্রথম ডিভিসনে উঠে আসা কাস্টমসের অবস্থা অন্যান্য অনেক টিমের চেয়েই ভালো। ১৪টি ম্যাচ থেকে ওরা ১৪ পয়েন্টই ঘরে এনেছে। অন্যদিকে বি এন আর খেলেছে ১৬টি ম্যাচ এবং ওদের প্রাপ্ত পয়েন্ট সংখ্যাও ১৪।

●

বিভাসের হ্যাটট্রিক

১২ জুলাই জর্জ টেলিগ্রাফ পরিষ্কার তিন গোলে পোর্ট ট্রাস্টকে হারিয়ে ষোড়শ ম্যাচে পঞ্চম জয় পেল, অবশ্যই ইস্টার্ন কম্যাণ্ডের বিপক্ষে ওয়াকওভার ধরে। জর্জের পক্ষে এদিন বিভাস সরকার মরশুমের তৃতীয় হ্যাটট্রিকটি করল। আগের দুটি হ্যাটট্রিক হয়েছিল ইস্টবেঙ্গলের সাবির আলি ও মিহির বসুর দ্বারা। জর্জ প্রথম দিকের হতাশা কাটিয়ে উঠে শেষের দিকের কয়েকটি ম্যাচে ভালোই খেলছে। কয়েকটি খেলায় জিতেছে, এমনকি মহমেডানের বিপক্ষেও একটি পয়েন্ট ছিনিয়ে নিয়েছে। প্রথম দিকের বিপর্যয়কর অবস্থা ওরা অনেকটা কাটিয়ে উঠেছে। ১৬টি ম্যাচে এখন ওদের পয়েন্ট ১৭। অন্যদিকে পোর্টও ১৬টি ম্যাচ খেলেছে, কিন্তু ওদের অর্জিত পয়েন্ট সংখ্যা মাত্র ১১।

এদিনের অপর খেলায় ইস্টার্ন রেল নামমাত্র গোলে পরাভূত করেছে কালিঘাটকে। কালিঘাট এবারের লিগে যেমনভাবে শুরু করেছিল, পরের দিকে সেই ধারা অবশ্যই বজায় রাখতে পারেনি। এদিনের জয় নিয়ে ইস্টার্নের পুরো পয়েন্ট হল পাঁচটি ম্যাচে। ওদের মোট পয়েন্ট ১৬, ষোলটি ম্যাচেই। কালিঘাটও ১৬টি খেলাতেই এ পর্যন্ত মাঠে নেমেছে, ওদের ঘরে পয়েন্ট জমা পড়েছে ১৪টি।

●

ফুটবল লিগে কবে কার খেলা

২০ জুলাই : ইস্টবেঙ্গল : খিদিরপুর (ইস্টবেঙ্গল), ইস্টার্ন রেল : টালিগঞ্জ অগ্রগামী (মোহনবাগান), জর্জ টেলিগ্রাফ : বি এন আর (মহমেডান)।

২১ জুলাই : মোহনবাগান : মহমেডান (প্রদর্শনী খেলা) (মোহনবাগান)।

২৩ জুলাই : ইস্টবেঙ্গল : ইস্টার্ন কম্যাণ্ড (ইস্টবেঙ্গল), খিদিরপুর : পোর্ট ট্রাস্ট (মোহনবাগান), হাওড়া ইউনিয়ন : উয়াড়ি (হাওড়া ইউনিয়ন)।

২৪ জুলাই : মহমেডান : টালিগঞ্জ অগ্রগামী (মহমেডান), রেলওয়ে ফুটবল ক্লাব : রাজস্থান (মোহনবাগান), ভ্রাতৃ সংঘ : কুমারটুলি (ইস্টবেঙ্গল)।

২৫ জুলাই : মোহনবাগান : কাস্টমস (মোহনবাগান), এরিয়ান : কালিঘাট (এরিয়ান), পুলিশ : বি এন আর (মহমেডান)

২৬ জুলাই : ইস্টবেঙ্গল : সালকিয়া ফ্রেণ্ডস (ইস্টবেঙ্গল), ক্যালকাটা জিমখানা : ইস্টার্ন কম্যাণ্ড (মহমেডান)।

২৭ জুলাই : মহমেডান : উয়াড়ি (মহমেডান), ভ্রাতৃ সংঘ : ইস্টার্ন রেল (মোহনবাগান), কুমারটুলি : স্পোর্টিং ইউনিয়ন (ইস্টবেঙ্গল)।

●

সাংবাদিকদের বিচারে সেরারা

কলকাতা ক্রীড়া-সাংবাদিকদের বিচারে ১৯৭৮ সালের সেরা খেলোয়াড়দের নাম সম্প্রতি প্রকাশ করেছে কলকাতা ক্রীড়া-সাংবাদিক ক্লাব। ক্লাবের সদস্যদের বিচারে '৭৮-এর সেরা ফুটবলার সুব্রত ভট্টাচার্য, সেরা ক্রিকেটার সুব্রত পোড়েল। এ ছাড়া যারা সেরা বলে বিবেচিত হয়েছে তারা হল রীতা সেন এবং ও এল টমাস (অ্যাথলেটিক্স), নিতাই পুরকায়েত (সাঁতার), তাপসী চৌধুরী (ভলিবল), কালোবরণ কোলে (কবাডি), সুরেশ মেহতা (হকি), গৌতম দে (টেবল টেনিস), মধুমিতা গোস্বামী (ব্যাডমিণ্টন) তারক সরকার (বাস্কেটবল)। ●

উঠছে যারা

নতুন বিভাগ, ১৪ বছরের কম বয়সীরাই এই বিভাগে লিখবে, আঁকবে। লেখা ফুলস্কেপ কাগজের একদিকে স্পষ্ট করে লিখবে আর ছবি কালো কালিতে আঁকবে। একই কাগজে লেখা আর ছবি পাঠাবে না। অংশগ্রহণকারী সকলকে বিদ্যালয়ের প্রধানের সই করা বয়সের সার্টিফিকেট দিতে হবে। বাড়ির ঠিকানা দিতে ভুলবে না। খামের ওপর লিখে দেবে 'উঠছে যারা'।

রেফারি



অরুণা মাসী গলায় বাঁশী
মাঠে যখন নামে
ফুটবলটা হঠাৎ গিয়ে
মাঠের মাঝে থামে।

পরিতোষ দাস (১২)

সমান সমান



দুই দলই সমান সমান
ড্র-টা হল তাই
মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল
কোরনা ঝগড়া ভাই।

রিঙ্কু রায় (১৩)



মহঃ স্পোর্টিং : ইস্টার্ন রেল

দাদার হাত ধরে কলকাতায় প্রথম ডিভিসন ফুটবল লিগে মহমেডান বনাম ইস্টার্ন রেলের খেলা দেখতে গিয়েছিলাম। সেই দিনের আবহাওয়া খুবই সুন্দর ছিল বলে আমার খেলা দেখতে কোন রকম অসুবিধা হয়নি। টিকিট কেটে মাঠে ঢোকার কিছুক্ষণের মধ্যেই খেলা আরম্ভ হয়।

প্রথমার্ধে দুই দলই সমান তালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, কিন্তু লতিফুদ্দিনের চোট লাগায় দর্শকরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং মাঠের মধ্যে মারামারি আরম্ভ হয়ে যায়। সমরেশ চৌধুরী, হাবিব, রহমান ও অন্যান্যদের চেষ্টায় আবার খেলা শুরু হয়।

দ্বিতীয়ার্ধের খেলা আরম্ভের কিছুক্ষণের মধ্যেই মহমেডান পেনাল্টি পায়, গোল করে সানজারি। খেলা শেষ হবার দশ পনের মিনিট আগে হাবিবের একটি সুন্দর পাস থেকে লতিফুদ্দিন দ্বিতীয় গোল করে। প্রেমনাথ ফিলিপের খেলা আমার খুব ভালো লেগেছিল।

আব্দুল কালাম
বয়স ১৩, সপ্তম শ্রেণী,
ভাঞ্জিপুর দেশবন্ধু বিদ্যানিকেতন,
তারকেশ্বর।



ছবি এঁকেছে রাজর্ষি রায়চৌধুরী (৭), নতুন দিল্লি-১

আগস্টে কলকাতায় সর্বভারতীয় ওয়াটারপোলো ঃ ট্যাঙ্কগুলি চঞ্চল

ভুবনেশ্বর পাণ্ডে ঃ মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে কলকাতার তথা পশ্চিমবাংলার সাঁতার হঠাৎ যেন ঝিমিয়ে পড়ে ধুঁকতে শুরু করেছে। রাজ্য সাঁতার সংস্থা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়েছে। ক্লাবে ক্লাবে কর্মকর্তা মহলে দলাদলি বেড়েছে। একই রাজ্যে দুটি অস্তিত্ব মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। ফলে অন্তর্দ্বন্দ্বের লড়াই প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলছে। সাঁতারুদের দলবদলের প্রলোভনে নাচিয়ে মিথ্যা আশ্বাসে ভোলান হচ্ছে। রাজ্যস্তরের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় জাতীয় রেকর্ড ম্লান করার নজীর দূরীভূত হয়েছে। জাতীয় প্রতিযোগিতায় বাংলার সাঁতারের ধারা ক্রমশই হ্রাস পেতে বসেছে। সর্বভারতীয় পর্যায়ে এই রাজ্যে বড় বড় প্রতিযোগিতামূলক সাঁতারের আসর বসানোর উৎসাহও লোপ পেয়েছে।

অথচ ১৯৮২ সালে এশীয় প্রতিযোগিতার আসর আবার বসছে দিল্লিতে। একত্রিশ বছর আগে এশীয় প্রতিযোগিতার সূচনাতে বাংলার সাঁতারু শচীন নাগ শত মিটার ফ্রি-স্টাইলে সোনা পেয়ে এশিয়ার মধ্যে দ্রুতগামী সাঁতারু হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। আশু দত্ত, বিমল চন্দ্র ওই প্রতিযোগিতায় বিশিষ্ট আসন দখল করে বাংলার সাঁতারের ধারাকে অক্ষুন্ন রাখেন। বেশীর ভাগ বাঙালী খেলোয়াড়ে পুষ্ট ভারতীয় ওয়াটারপোলো দল এশীয় চ্যাম্পিয়ন হয়ে সকলকে হতবাক করে দেয়।

১৯৫১ থেকে '৮২ এই দুই এশীয় প্রতিযোগিতার মধ্যে আমরা দেখতে পাই পঞ্চাশের দশকে ভারতীয় সাঁতারের পুরোধা ছিল বাংলার সাঁতারুরা। কিন্তু আশীর দশকে বাংলার সাঁতারুরা দলাদলির আবর্তে পড়ে ক্রমশই পাঁকে তলিয়ে যাচ্ছে। বাঙ্গালীর জাতীয় সাঁতার সংস্থায় নেতৃত্বের যে রেশটুকু আজও বিদ্যমান তাকে কিন্তু প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে বাংলা বিরোধী মনোভাবের জন্য। অথচ বাংলার বিপর্যয়কে ঘিরে জাতীয় স্তরের সাঁতারে ভারতের বিপর্যয় যে অগোচরে ঘটে যাচ্ছে সেটা বোঝার ক্ষমতা কর্মকর্তারা হারিয়ে ফেলেছেন। কারণ হলফ করে বলতে পারি ১৯৮২-এর এশীয় প্রতিযোগিতায় বাংলা কেন ভারতীয় সাঁতারুর কেউই কোন পদক পাবে না।

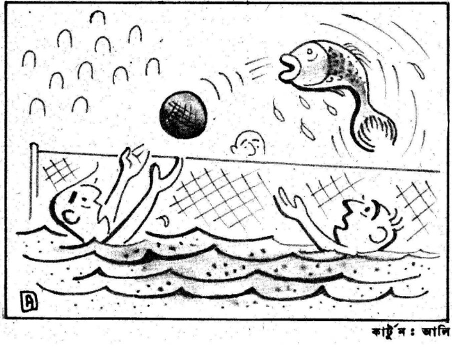
ভারতীয় সাঁতারের এই নিদারুণ অবস্থার মুখোমুখী হয়েও রাজ্য বা জাতীয় স্তরের কর্মকর্তা মহলে এতটুকু উদ্বেগের চিহ্ন পরিলক্ষিত হচ্ছে না। ফলে ৮২ সালের জন্য সর্বভারতীয় পর্যায়ে এখনও কোন প্রস্তুতি বা পরিকল্পনার কথা শোনা যাচ্ছে না।

এই অচলায়তন ভাঙতে কলকাতার ওয়াই এম সি এ-র কিছু প্রাক্তন সাঁতারু সদস্য একত্রিত হয়ে সংকল্প নিয়েছেন কলকাতার বুকে তারা সর্বভারতীয় পর্যায়ে ওয়াটার-পোলোর আসর বসাবেন আগস্ট মাসের ৭ থেকে ১১ পর্যন্ত। ওয়াই এম সি এ-র আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছেন ভারতের কৃতি ওয়াটারপোলো খেলোয়াড়রা বিভিন্ন দলের মাধ্যমে। ক্লাব ভিত্তিতে কলকাতায় এতবড় ওয়াটারপোলোর আয়োজন হয়তো প্রথম। যেখানে দিল্লি, কেরালা, সেনাদল, ইস্টার্ন, সাউথ ইস্টার্ন রেল, বোম্বাই-এর ওয়েস্টার্ন রেল, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ ও ভারতীয় নেভির খেলোয়াড়দের সঙ্গে কলকাতার ছোট বড় সব ক্লাবের খেলোয়াড়রা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করার সুযোগ পাবে।

১৯৭৪ সালে জাতীয় সাঁতারের আসরের পর কলকাতায় বড় রকমের সাঁতারের আয়োজন বড় একটা চোখে পড়েনি। জাতীয় প্রতিযোগিতায় কেবল রাজ্য স্তরের সেরা খেলোয়াড়দেরই বাছাই করা হয়। কিন্তু ক্লাবভিত্তিক সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় রাজ্যের সমস্ত খেলোয়াড়ই অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। সুতরাং কলকাতার ক্লাবে ক্লাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আমেজ অনুভূত হচ্ছে। অনুশীলনের মাদকতায় কলকাতার ক্লাবগুলি হঠাৎ যেন জেগে উঠেছে। যেন মরা গাঙে বান ডেকেছে। হেদুয়া, কলেজ স্কোয়ার, লেকে, কলকাতার যে কোন জলাশয়ের ধারে বিকালের মরশুমে দেখা যাবে ওয়াটারপোলো খেলা চলছে বিরাট উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে। উদ্দেশ্য ওয়াই এম সি এ শতবর্ষ ওয়াটার-পোলোতে ভাল ফল পাওয়া।

মির্জাপুর স্ট্রিটের ছটি খালি বাড়িতে বহিরাগত খেলোয়াড়দের বাসস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। সমস্ত দলকে ট্রেনে যাতায়াতের খরচ ছাড়াও দৈনিক হাত খরচ সমেত খাওয়ার টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। সর্বসাকুল্যে ২৫-৩০ হাজার টাকা খরচের ঝুঁকি মাথায় নিয়েও ওয়াই এম সি এ-র উৎসাহী সাঁতারুরা একটুও পিছ-পা হয়নি। কারণ সংকল্পে তারা অটুট। ক্লাব তহবিল থেকে এক পয়সা না নিয়ে, সরকারী সাহায্যের উপর নির্ভর না করে তারা এই প্রচেষ্টাকে সার্থক করে তুলতে চায় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে দান নিয়ে।

কর্মকর্তাদের ওপর নির্ভর না করে বাংলার প্রাক্তন সাঁতারুরা একটু উদ্যোগ, একটু ঝুঁকি নিলে কলকাতার প্রতিটি ক্লাবের সীমানায় এই রকম প্রতিযোগিতা হবার সম্ভাবনা রয়ে গেছে। আন্তর্জাতিক সাঁতারে ভারতীয়দের বিশিষ্ট স্থান পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকলেও আমি বিশ্বাস করি ওয়াটারপোলোতে ভারতীয়রা একটা স্থান করে নিতে পারে। এখন থেকেই সর্বভারতীয় পর্যায়ে ক্রমাগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে ভারতীয় ওয়াটারপোলোর মান উন্নত করার সুযোগ রয়ে গেছে। ওয়াই এম সি-এর সদস্যরা সেটাই প্রমাণ করে দিয়ে বাংলার সাঁতারে যে নতুন চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটাল তার জন্য সাধুবাদ নিশ্চয়ই তারা পাবেন।



কার্টুন : আলি

অন্য চোখে

ব্যাসদেব ঃ সাত জুলাই কে লিগ চ্যাম্পিয়ন হবে তা ঠিক হয়ে যাবার কথা থাকলেও যখন তা হল না দেখে, সবাই নতুন করে মাথা ঘামাচ্ছে। সেই ফাঁকে আমি বেরিয়েছিলুম কে চ্যাম্পিয়ন হবে তা জেনে 'ই-স্কুপ' নিউজ করার ধান্দায়।

চেতলার সেই স্বপ্নাদিষ্ট আদি ফুটবলেশ্বরের মন্দিরের পুরোহিত কাম জ্যোতিষ আমাকে দেখামাত্রই বত্রিশটি দাঁতের একজিবিশান খুলে চিল্লিয়ে উঠলেন, জানতুম, আসতেই হবে আবার। তা এবার কি ধান্দায় এ মুল্লুকে পা পড়ল শুনি? তাকে বললাম, দেখুন ধান্দা নয় আপনার কাছে জানতে এলুম বিগ ম্যাচ না জিতেও কে এবার চ্যাম্পিয়ন হবে। পুরোহিত জ্যোতিষ বললেন, দেখুন মোহনবাগান না ইস্টবেঙ্গল কে লিগ পাবে তা ডিপেণ্ড করছে এখন মহমেডানের ওপর। আই মিন তারা কাকে আটকাবে আর কাকে ছাড়বে তার ওপর। তবে আট বছরের আগে যে লিগে দুই প্রধানের খেলা আর ড্র হবে না সেটা এখনই বলে দিচ্ছি।

আমাকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে দেখে তিনি এবার খিঁচিয়ে উঠলেন ঃ দূর মশাই এটাও জানেন না। একাত্তরে লিগে শেষবার মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলের খেলা ১—১ হয়েছিল। আবার ১৯৮৭-তে হবে এরপর।



পুরোহিত জ্যোতিষকে ছেড়ে পত্রপাঠ মহমেডানের কোচ রহমান সাহেবকে (তখনও কোচ ছিলেন) গিয়ে পাকড়াও করতেই তিনি যেন তেড়ে এলেন। আমি কোচ না হাবিব কোচ সেটাই ঠিক হল না এখনও আর আপনি জিজ্ঞেস করছেন লিগ কে পাবে? যতদূর শুনছি আমি কোচ থাকছি না। যদি থাকতুম তবে দুজনকেই হারানোর ব্যবস্থা করতুম যাতে মহমেডান লিগ পেয়ে যায়।

মোহনবাগান টেণ্টে অনেক চেষ্টা করেও পি কে-কে ফাঁকায় না পেয়ে একদিন তার অফিসে গিয়ে ঢু' মারলাম। তিনি বললেন, লিগ কে পাবে তা নিয়ে আমি আদৌ মাথা ঘামাচ্ছি না। গোল অ্যাভারেজে যে এগিয়ে থাকবে তারই লিগ পাবার কথা। তবে সব হজপচ করে যদি আবার খেলানোর ব্যবস্থা হয় তবে এবার কিছুতেই ইস্টবেঙ্গলকে আগে মাঠে নামতে দেব না। সাতই জুলাই আমরা আগে নামব বলা সত্তেও ওরা নেমে গেছে আগে।

আই এফ এ সম্পাদক অশোক ঘোষের কাছে গিয়ে কথাটা পাড়লুম তারপর। তিনি আকাশ থেকে পড়লেন কথাটা শুনে ঃ আপনি যে কি ভেবে আমার কাছে এলেন আমি তো সেটাই ভেবে পাচ্ছি না। তবে যে-ই লিগ চ্যাম্পিয়ন হোক বাকি দুটো একজিবিশন ম্যাচের একটাও টিকিট যে পড়ে থাকবে না সেটা এখনই বলতে পারি।

মহমেডান ছাড়া আর যে দলগুলোর সঙ্গে দুই প্রধানের খেলা বাকি আছে তাদের কারো কারোকে বাজিয়ে দেখলুম তারপর। বলা যায় না তাদের মধ্যেও কেউ তেড়েফুঁড়ে খেলে যে কোনো এক প্রধানকে আটকে দেয় যদি।

রেলিগেশন ফাইট করছে এমন একটা দলের এক কর্মকর্তা বললেন, দেখুন আদার ব্যাপারীর যে জাহাজের খবরে দরকার নেই এই সোজা কথাটাও যখন আপনার মাথায় ঢোকেনি তখন শুনুন। একটা বড় দলের সঙ্গে আমাদের খেলা হয়ে গেছে আর একটা হবে। সাত জুলাই কে লিগ পাবে তা যখন ঠিক হয়নি তখন মিছিমিছি অন্য বড় টিমটাকে আমরা আটকাতে যাব কেন? দ্বিতীয় ডিভিসনে যদি নামতেই হয় তার আগে আর একটা 'বিগ ম্যাচ' দেখে নেওয়াই ভাল।

আর একজন বললেন, দু'দলের কারো সঙ্গেই আমরা খেলিনি এখনও। তবে সাত জুলাই রেজাল্ট না হওয়ায় ছেলেগুলো আবার পুরোদমে প্র্যাকটিস করছে। ওরা ভেবেছিল যে হারবে ওই দিন তাদের সঙ্গে আমাদের ম্যাচে বেশী লোক হবে না। তাই একটু মুষড়ে পড়েছিল আর কি। ●

দর্শকের আচরণ ঃ হারবার্ট কি বলেন

প্রবাসী/১৩৩০/১৯২৩

যে সকল লোক দলে দলে ফুটবল খেলার পাশবিকতা দেখিতে ছুটে, যাহারা লোমহর্ষক চীৎকার করিয়া খেলোয়াড়দিগকে উপদেশ দেয় এবং রেফারির ব্যবহার পছন্দ না হইলে তাহাকে এমন করিয়া আক্রমণ করে যে তাহাকে পুলিশের সাহায্য লইতে হয়, সেই সকল লোক সাধারণ উন্নতির জন্য কার্য করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেও কদাপি পরস্পরের অধিকার সম্বন্ধে সযত্নে বিবেচনা করিবে না।

—হারবার্ট স্পেনসার

কথাগুলি বাঙ্গালী দর্শকদের দেখিয়া লিখিত হয় নাই, বলা বাহুল্য, কিন্তু বাঙ্গালীদের সম্বন্ধে কথাগুলির মূল্য যথেষ্ট আছে। অনেকের বিশ্বাস যে ফুটবল খেলার জায়গায় গিয়া বিকট চীৎকার করিলে খেলাধূলার প্রতি সহানুভূতি দেখান হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, দর্শকদিগের মধ্যে যাহারা যত চীৎকার করেন, তাহাদের খেলা সম্বন্ধে জ্ঞান তত কম। স্পেনসার যে খেলার পাশবিকতার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা খেলার অঙ্গ নহে, তাহার বিকার। অনেক খেলোয়াড় উন্মত্তের মত খেলার সংযম, মনুষ্যত্ব এবং নিয়ম কানুন তুচ্ছ করিয়া পাশবিকভাবে পরস্পরকে আহত করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাহাদের ব্যবহার সর্বতোভাবে নিন্দনীয়।...

—বিকাশভানু সংকলিত

গুজব, না সত্যি, গুজব

খবর্দার ঃ বর্ষার সিজন, বর্ষণের নাম নেই। কিন্তু ময়দানের বটগাছটির রমরমা। উপরে এবং নীচে। উপরে কচি সবুজ পাতার জমাটি আসর, নীচে কচি-কাঁচা-আধ পাকা-পাকাদের মজলিস। বড় খেলা সাঙ্গ, ওই কচিপাতার ছত্রছায়ায় বসে ভাবছিলাম নানা কথা। কিন্তু তুমি ভাবলে কি হবে, তোমাকে ভাবাতে দেবে ?

'হেই পাঁচুদা—কি ভাবছ বসে ? রহমান না অমল দত্ত ?' হৈ হৈ করে তিন মূর্তির আগমন। বোঝ ঠ্যালা।

'না ভাই—কারও কথা নয়। ভাবছি কেবল নিজের কথা।' এড়াতে চাই।

'দেখ পাঁচুদা, ঘাবলাবাজি কোর না। বটতলায় বসে কেউ নিজের কথা ভাবে না।'

কথাটা অস্বীকার করি কি করে ?

'তা বল কি খবর ?' যত্র দেশে যদাচার।

'এই তো বাবা পথে এসো। আজকের লেটেস্ট খবর হল রহমান গেলেও অমল দত্ত মহমেডানের কোচ হচ্ছে না।'

'কেন—এই তো কাগজে পড়লাম—দায়িত্ব নিয়ে অমল দত্ত মাঠে নেমেছে বা নামবে।'

'তাই কখনও হয় ! এইতো শুনে এলাম অমল দত্ত নগদানগদি পনের হাজার টাকা চেয়ে না পেয়ে মহমেডানকে সাফ বলে দিয়েছে টাকা না পেলে তিনি মাঠে নামতে নারাজ।'

'দূর ! আমি তো শুনলাম অমল দত্তের ক্লাব রাজস্থান ওকে ছাড়তে রাজি নয় !' দ্বিতীয় মূর্তির বক্তব্য।

'তা তোমরা সব মহমেডানকে নিয়ে পড়লে কেন ?' আমি ওদের সুধাই।

'আচ্ছা তুমি বোঝ তরুণদা এখন মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল যাই বল না কেন মরণকাঠি তো ওই মহমেডানের হাতেই।' প্রথম মূর্তি।

'সেটা কি রকম ?—' জানতে চাই।

'দেখ একেবারে ছকের ব্যাপার—' ও বেশ গুছিয়ে বসল। 'তুমি ভুলে যাচ্ছ—পিণ্টু কিভাবে দল ছেড়েছে, হাবিব-আকবর কেনই বা মোহনবাগান ছাড়ল। পিণ্টুর দুঃখের সাতকাহন তোমরা সবাই জান। হাবিবের দুঃখও কি কম ? ভাইকে রাখবে না বলল মোহনবাগান—সেই ভাই-এর জন্য দল ছেড়ে কসম খেল এর বদলা নেবে। শোনা যাচ্ছে আকবর নাকি হাকিমি চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত কলকাতায় এসে পৌঁছেছে। এবং যদি পারে তবে মাঠেও নামবে—তবেই ব্যাপারটা বোঝ ?'

'তা মোহনবাগানের ব্যাপার তো বুঝলাম—ইস্টবেঙ্গল ?'

'কেন মনে নেই পিণ্টুর প্রতিজ্ঞা ! অপেক্ষা কর, কি যে করবে পিণ্টু ও হাবিব দুই প্রাক্তন ইস্টবেঙ্গলী তা বলা দায়।'

'তা যা বলেছ—আচ্ছা মোহনবাগানের মোহন ছেত্রী আর কি যেন থাপার কি খবর ?' আমি জানতে চাই।

'ওহো ! তাও বুঝি শোননি ? সেই একই কেস। টাকা-পয়সা ছেত্রী পায়নি তাই খেলবে কিনা কে জানে ! থাপা যে কেন আসছে তা জানে থাপাই। শুনছি বর্মায় খেলে—আরে বর্মা থেকে কলকাতা তোর ভাল হল ?'

তৃতীয় মূর্তি ইস্টবেঙ্গল সমর্থক। ওর কথায় তাই কানই দিলাম না। বরং উল্টে ওকে ছোট্ট করে আঘাত দিয়ে বললাম—



'হ্যারে ছেত্রী না হয় টাকা পায়নি বলে খেলবে না। তা তোদের চিন্ময় কি টাকা পেয়েছিল বলে বড় খেলায় খেলল না ?' বলেই হেসে ফেলি, যদি রেগে যায় ? ছেলে ছোকরাদের রাগ তো।

'কেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিচ্ছ ? একটা খবর বলি, চিন্ময়ের বাড়ির সামনে খুব পোস্টার পড়ছে। যাই বল দাদা, এটা ঠিক নয়। চিন্ময়ের ভুলের শাস্তি ও নিজেই পাচ্ছে। বেচারা ! তবে আবার যদি খেলা হয় তবে ও সুদে আসলে প্রায়শ্চিত্ত করবে।'

'খেলা কি আর হবে ? পি কে নাকি বলেছে যে, ওসব চলবে না। গোল অ্যাভারেজে যে দল এগিয়ে থাকবে তারাই চ্যাম্পিয়ন হবে। আর গোল অ্যাভারেজে তো অবশ্যই—সুতরাং মোহনবাগান রাজি হবে না।' আমি একটু জ্ঞানবান হতে চাই।

'আসলে ওসব নয়, দু'দলকে আবার খেলাতে হবেই যে করে হোক। কারণ সাত তারিখের খেলা আমাদের ক্রীড়াপাগল মুখ্যমন্ত্রী দেখতে পাননি, বিদেশে থাকায়। তাই নির্দেশ—ড্র কর, আবার খেলা হবে—আমি ফিরে এসে ওই খেলা দেখব, তবে রফা হবে। অতএব বোঝ ব্যাপার।'

মুদ্রক ও প্রকাশক ঃ অরুণ কুমার পাল, মৌসুমী প্রিণ্টার্স, ৭৭/২/১, লেনিন সরণি, কলকাতা-৭০০০১৩, ফোন ২৪-৫৫২০ থেকে মুদ্রিত এবং ইত্যাদি প্রকাশনী, ৪৭ বিপ্লবী অনুকূল চন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭২, ফোন ২৭-৩৩১৬, ২১-২১৬৬ থেকে প্রকাশিত

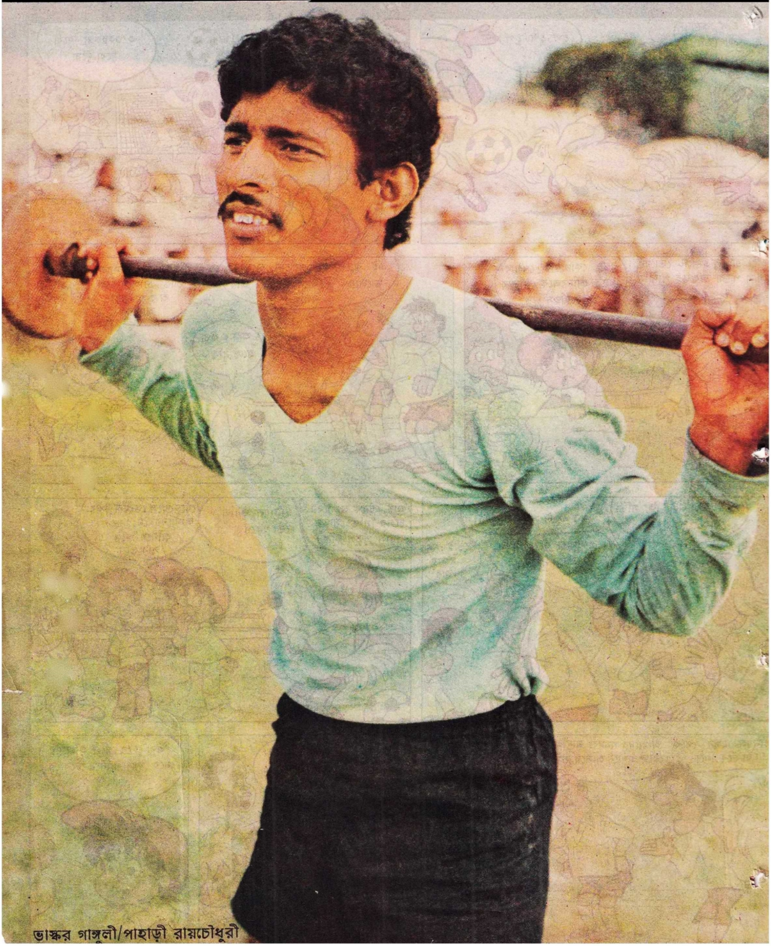
জয় ফুটবল জয়

(পনেরো)

আলেখ্য : ভাল্টার নয়গেবাউয়ার,
অনুবাদ : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত



Registration No. 30198/77 KHELAR AASAR 20th July 1979 WB/CC—334/77 Rs. 1.50



ভাস্কর গাঙ্গুলী/পাহাড়ী রায়চৌধুরী